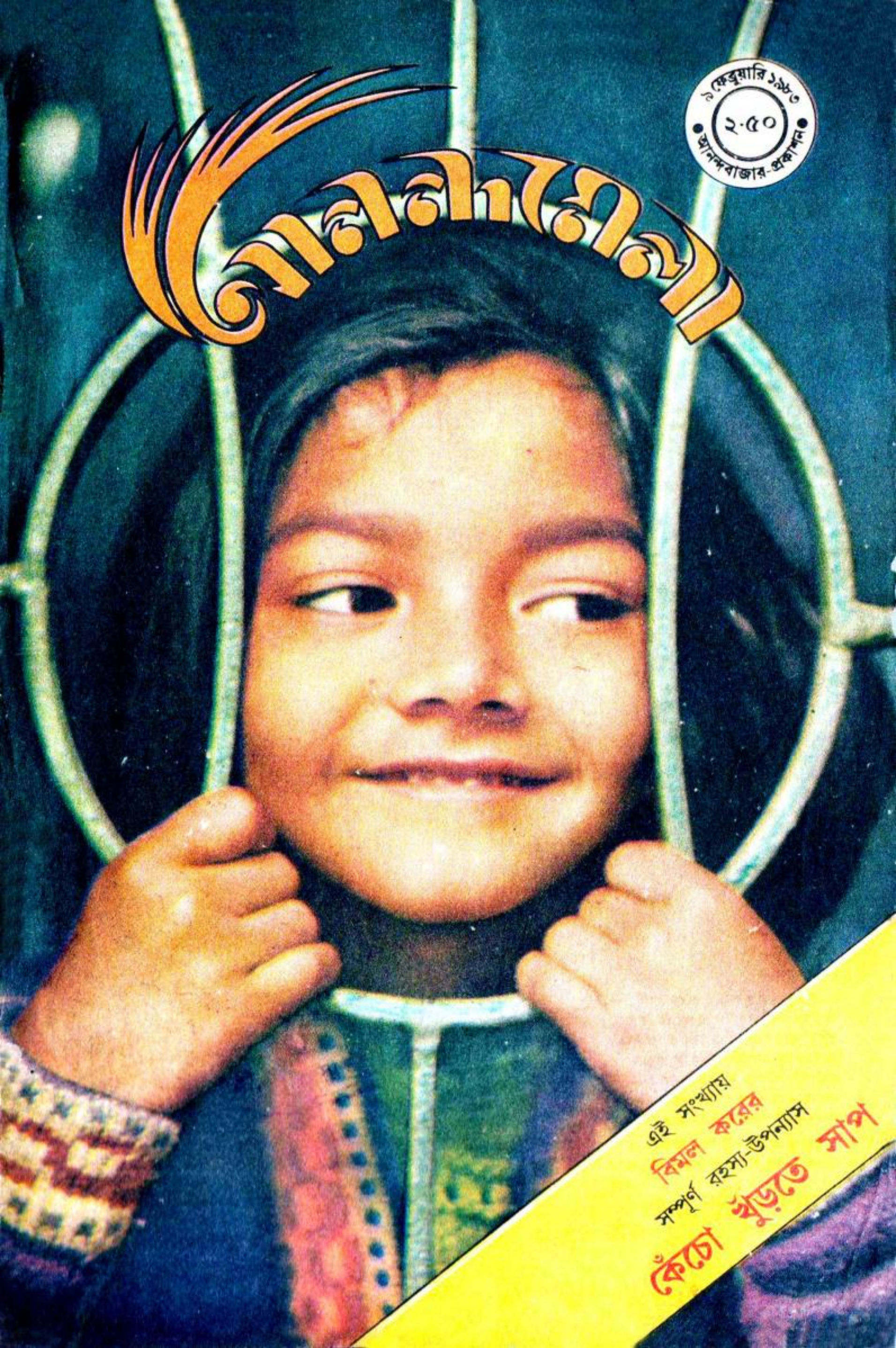
আনন্দমেলা
৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
২·৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন
এই সংখ্যায়
বিমল করের
সম্পূর্ণ রহস্য-উপন্যাস
কেঁচো খুঁড়তে সাপ

তাড়াতাড়ি করুন! ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড পট্টি লাগান আপনার বাচ্চাকে সুরক্ষিত রাখার শ্রেষ্ঠ উপায়

ওর এই অনাবৃত ক্ষতে একটুও ধুলোবালি লাগলেও তা দূষিত হয়ে উঠতে পারে

সারা বিশ্বে মায়েরা অনাবৃত ক্ষতকে সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য **ব্যাণ্ড-এইড** পট্টির ওপর নির্ভর করেন।

ব্যাণ্ড-এইড পট্টিতে আছে একটি প্রমাণিত এনটিসেপটিক যা ক্ষতের উপশমে সাহায্য করে। এর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হাওয়া চলাচল করে ব'লে ক্ষতকে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে সারিয়ে তোলে। তাছাড়া এতে আছে বেশী আরামদায়ক অনন্য একটি প্যাড যা চট্‌চট করে না।

ব্যাণ্ড-এইড পট্টি নানা আকারে ও সাইজে পাওয়া যায়। গুরুতর ক্ষত, কাটা-ছ'ড়ে যাওয়া, যেখানে সাধারণত পট্টি লাগানোর অসুবিধে, ফোড়া ও ঘস্টানি — সব ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। হাতের কাছে **ব্যাণ্ড-এইড** পট্টি রাখুন। সবসময়ে।

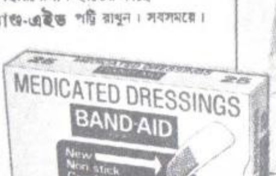

ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড পট্টি

সংক্রমণের হাত থেকে নির্ভরযোগ্যভাবে সুরক্ষিত রাখে

Johnson & Johnson

BAND-AID and JOHNSON & JOHNSON are trademarks of JOHNSON & JOHNSON

OBM/9283/BN

নতুন ক্লাসে নতুন বই,
নতুন নতুন খাতা,
তার উপরে সরস্বতীর
আসনখানি পাতা।
ছোট্ট খোকাও ঘুমের থেকে
উঠল তড়িঘড়ি,
মা বলেছেন, এইবারে তার
হবেই হাতেখড়ি।

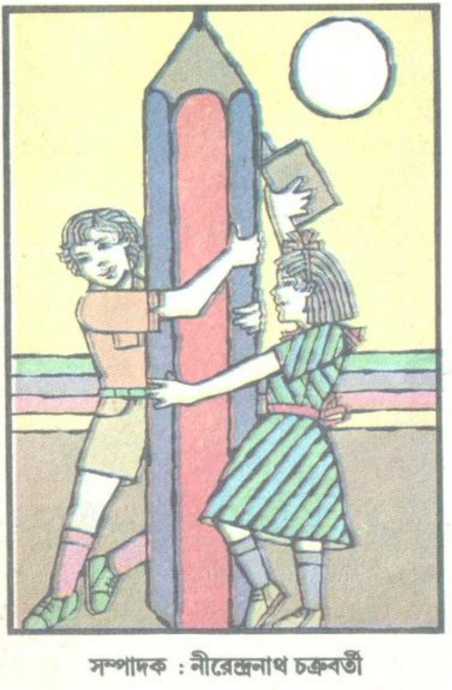

২৬ মাঘ ১৩৮৯ ● ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
৮ বর্ষ ● ২২ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

কেঁচো খুঁড়তে সাপ। বিমল কর ৫০

ভ্রমণ-কাহিনী

এভারেস্টের কাছে। মন্দ্রিতা সেনগুপ্ত ৬

গল্প

অলৌকিক। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৪
দারোগার দুর্নীতিদমন।
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯
ধীরাজের লাঞ্চ খাওয়া। মঞ্জিল সেন ২৫

ধারাবাহিক উপন্যাস

জঙ্গলগড়ের চাবি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩১
রুআহা। বুদ্ধদেব গুহ ৪৫

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ৭৬
উইং থেকে গোল। পি কে ৭১

ছড়া

মেছো কথা। গৌতম বেনেগল ৫
মাথা। বিমল দত্ত ২৯

অন্যান্য আকর্ষণ

কমিকস, লেখাপড়া, খেলাধুলো, ধাঁধা
শব্দসন্ধান, বিজ্ঞান-বিচিত্রা, তোমাদের পাতা

প্রচ্ছদচিত্র : তপন দাশ

আগামী সংখ্যায়
শৈলেন ঘোষের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
ইতিমিচিসাহেব

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাণাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

স্বাস্থ্যে ঝলমল, প্রাণে খুশী উচ্ছল!
বোর্নভিটা খান।

আপনার পরিবারকে দিন ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা যার স্বাদ তাদের খুব পছন্দ। স্বাদেভরা বোর্নভিটা, কোকো, মল্ট, দুধ, আর চিনির গুণে ভরপুর। বোর্নভিটা, আপনার পরিবারের সবাইকে প্রতিদিন দিন—দিনে দুবার ক'রে।

OBM/8845 R-BEN.

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা এর গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো!

মেছো কথা

গৌতম বেনেগল

নোংরা পচা ডোবার থেকে
ব্যাঙ-ব্যাঙাচি লাফায় দেখে
হারান চেঁচায়, "পালায় পালায়
হায় রে কপাল, হায় রে হায়!
এই যাঃ গেল, এই গেল যা—
ট্যাংরা মৃগেল কই পাবদা!
চিতল বোয়াল রুই কাতলা
শিঙ্গি মাগুর ভেটকি ভোলা!"
সবাই তখন বলল হেসে,
"পাগল হল হারান শেষে!
নইলে কি আর পচা ডোবায়
মাছের গন্ধ কেউ পেতে চায়?"

ছবি : গৌতম বেনেগল

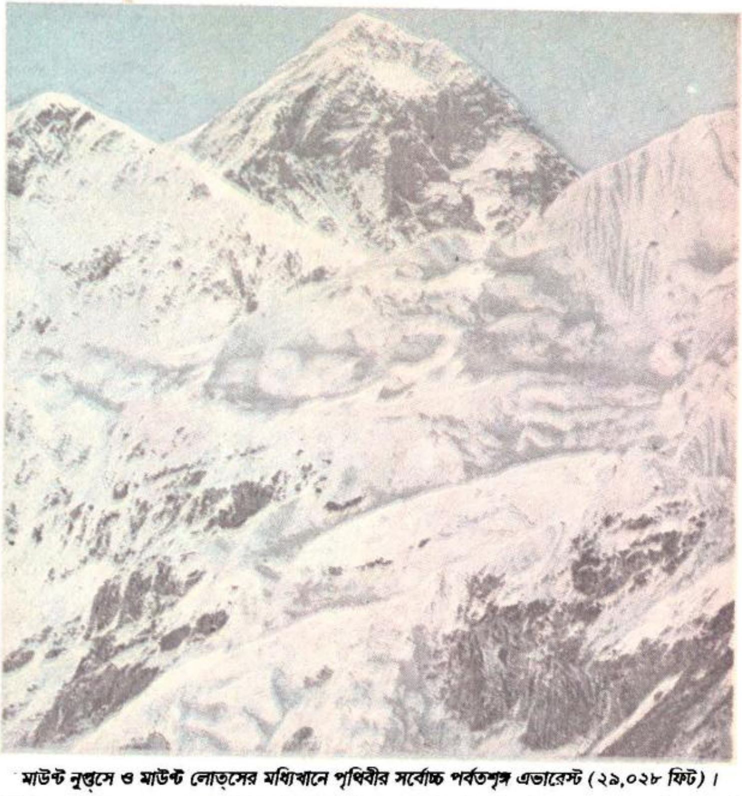

মাউন্ট নুপ্তসে ও মাউন্ট লোত্‌সের মধ্যিখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট (২৯,০২৮ ফিট)।

এভারেস্টের কাছে

মন্দ্রিতা সেনগুপ্ত

সবাই বলেছিল, এতটুকু মেয়ে কিছুতেই অত উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারবে না। পথ অত্যন্ত খারাপ, তার ওপর আছে যখন-তখন তুষারপাতের বিপদ। হাঁটতে হবে একটানা ছ-দিন। কিন্তু এগারো বছরের মেয়ে মন্দ্রিতা কিছুতেই দমবার পাত্রী নয়। পথের যাবতীয় কষ্ট, তুষারপাত, এমনকী তুষারঝড়ও অগ্রাহ্য করে বাবা-মায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠেছিল নেপালের দুর্গম কালাপাথার পাহাড়ের (১৮,২০০ ফিট) মাথায়। ঠিক এখানেই খাটানো হয়ে থাকে এভারেস্ট-অভিযাত্রীদের প্রথম বেস ক্যাম্প। মন্দ্রিতার ডায়েরির কয়েকটি পাতা ছাপানো হল এখানে।

১৪ অক্টোবর, ১৯৮২

আমরা দার্জিলিং মেলে শিলিগুড়ির পথে রওনা হলাম। আমরা বলতে—আমি, মা, বাবা ও উৎপলকাকু। আমরা যাচ্ছি নেপালের কালাপাত্থার পাহাড়ে (১৮,২০০ ফিট) চড়তে। যেখান থেকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টের সরাসরি দূরত্ব মাত্র ন' কিলোমিটার। এভারেস্ট-অভিযাত্রীদের বেস ক্যাম্প কালাপাত্থারের কাছেই খাটানো হয়।

১৫ অক্টোবর

আমরা নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে শিলিগুড়ির জেলা পরিষদ বাংলোয় কিছুক্ষণ কাটালাম। তারপর বিকেল চারটেয় নেপাল সীমান্ত কাকারভিটায় গিয়ে কাঠমান্ডুর নাইট বাসে উঠলাম।

১৬ অক্টোবর

কাঠমান্ডুতে বাস পৌঁছল সকাল সাড়ে-সাতটায়। কাল সকালে 'লুকলা'র প্লেন। একটা হোটেলে উঠলাম আমরা, তারপর এয়ারলাইনস অফিসে গিয়ে প্লেনের টিকিটগুলো রি-কনফার্ম করলাম। তারপর লাঞ্চ খেয়ে বেরুলাম আমাদের ট্রেকিংয়ের জন্য স্লিপিং ব্যাগ ও ফেদার জ্যাকেট যোগাড় করতে। এগুলো কাঠমান্ডুর 'থামেল' অঞ্চলে ভাড়া পাওয়া যায়। কাঠমান্ডুর এক কাকুর সাহায্যে সব যোগাড় হল।

১৭ অক্টোবর

ভোর থেকেই খুব উত্তেজনা। আজ লুকলা পৌঁছেই আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে। সকাল সাড়ে-সাতটায় ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখি বিদেশীদের ভিড়। সেই সঙ্গে রাকস্যাক, আইস-অ্যাক্স আর ক্র্যাম্পনের ছড়াছড়ি। সিকিউরিটি চেকিং পেরিয়ে লাউঞ্জে ঢুকে দেখি, লুকলার

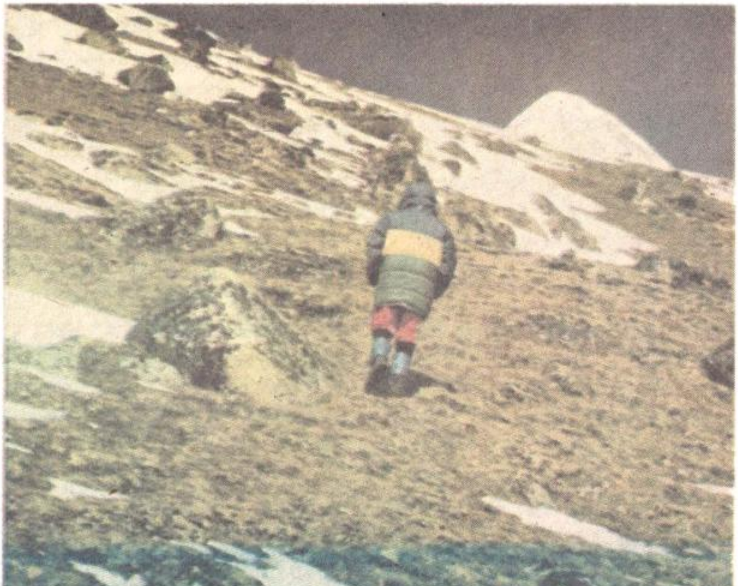

দুর্গম কালাপাত্থারের পথে।

জন্য ভারতীয় বলতে একমাত্র আমরাই। আর সব বিদেশী।

একটু পরে ষোলো-সিটের ছোট্ট একটা 'টুইন অটার' প্লেনে চড়ে আমরা উড়ে চললাম লুকলার দিকে। উত্তরে তুষারশৃঙ্গের সারি। দক্ষিণে সবুজ পাহাড়। নীচে ছোট-ছোট পাহাড়ি গ্রাম। মেঠো পথ। সরু নদী। পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা লুকলায় (৯,২০০ ফিট) পৌঁছে গেলাম। জায়গাটার প্রায় তিনদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ডান দিকে তুষারশৃঙ্গ। ছোট্ট এয়ার-স্ট্রিপ। দু'পাশে ঘর-বাড়ি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা কুলি ঠিক করে আমাদের হাঁটা শুরু হল। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে পায়ে চলার পথ। প্রথমেই নামা। লোকালয় পেরিয়ে নির্জন পথ। দুপাশে ঘন সবুজ পাহাড়। বাঁদিকে গভীর খাদ। ওপাশে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম। পৌনে-একটায় পৌঁছলাম ফাকডিং (৮,৭০০ ফিট)। সুন্দর রেস্টুরেণ্টে দুপুরের খাবার খেতে খেতে প্রত্যেকের খুব ভাল লেগে গেল জায়গাটা। দুধকোশী নদীর ধারে কটেজের সারি। চারদিকে পাহাড়। আমরা থেকে গেলাম।

১৮ অক্টোবর

সকাল সাতটায় হাঁটা শুরু হল। বেন্‌কার, মোঞ্জো গ্রাম পেরিয়ে জোরশালে গিয়ে পৌঁছলাম দশটায়। কুলি বলল, এরপর বিরাট চড়াই। এখানে খেয়ে নিন। পথের ধারের দোকানে আলুর তরকারি ভাত খেয়ে আবার এগোলাম। দুধকোশী নদী পেরিয়ে চড়াই শুরু। ওফ্! কী সাঙ্ঘাতিক চড়াই! উঠছি তো উঠছিই। পথ আর ফুরোয় না। প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক পরে দূরে পাহাড়ের কোলে নামচের ঘরবাড়ি দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছতে লাগল আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আমার মাথায় টিপ-টিপ ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ গা গুলোতে শুরু করল। বাবা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একেই বলে 'মাউন্টেন সিকনেস', এই পথে যার ভয় সব চাইতে বেশি। আমার খারাপ অবস্থা দেখে নামচের (১১,৩০০ ফিট) প্রথম হোটেলেই ঢুকে পড়ল সবাই। চটপট বিছানা ভাড়া করে মা আমাকে শুইয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

১৯ অক্টোবর

নামচে এই এলাকার সবচেয়ে বড় গ্রাম। ইংরেজি 'ইউ' হরফের মতো বাঁকানো পাহাড়ের তরাইয়ে বেশ জমজমাট জায়গা। হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, ব্যাঙ্ক, পোস্ট-অফিস—সব আছে এখানে। আমাদের হোটেলের পেছনেই বিশাল তুষারশৃঙ্গ। আজ আর হাঁটা নয়। পাহাড়ি উচ্চতার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ-খাওয়ানোর জন্য আজ এখানেই বিশ্রাম।

২০ অক্টোবর

সকাল সাতটায় থেয়াংবোচের দিকে হাঁটা শুরু হল। বিশাল পাহাড়ের গায়ে আঁকা-বাঁকা পথ। সামনেই আমাদাবালাম তুষারশৃঙ্গ। পাশে গভীর খাদ। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল সেই খাদের মধ্যে। সঙ্গে ভেসে গেল এক টুকরো মেঘ। তার মানে আমরা হাঁটছি মেঘ ও পাখিদেরও ওপরে। দুধকোশী নদী পার হবার আগে একটা ছোট্ট ঝুপড়িতে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম আমরা। নদী পার হবার পরে আবার বিরাট চড়াই। টানা দু-হাজার ফিট। জঙ্গলের পথ। প্রথমে খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু থেয়াংবোচের (১২,৭০০ ফিট) মাঠে যখন পৌঁছলাম, তখন আবার আমার মাথায় টিপ-টিপ ব্যথা শুরু হয়ে গেল। শুয়ে পড়লাম ঘাসের ওপর। আমাদের সামনে এখন তিনটে পর্বতশৃঙ্গ। এভারেস্ট, নুপ্‌সে, ও লোত্‌সে। ডানদিকে আমাদাবালাম। বাঁদিকে তুষারঢাকা অনেক পাহাড়। থেয়াংবোচের মনাস্ট্রির ঠিক নীচের হোটেলেই উঠলাম আমরা।

২১ অক্টোবর

আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর জন্য আজ সারাদিন এখানে বিশ্রাম নিলাম।

২২ অক্টোবর

ভোরে উঠে দেখি চারদিক মেঘলা। আশেপাশের সব পাহাড় অদৃশ্য। সাতটায় হাঁটা শুরু হল। ইম্‌জাখোলা নদী। ফাঙবোচে গ্রাম পেরুতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ওপরে উঠছি। ইম্‌জাখোলা ও খুম্বুখোলা নদী পাশে মিশেছে। সেদিকে গভীর খাদ। বৃষ্টির বদলে এবার গুঁড়ো নুনের মতো বরফ পড়তে শুরু করল। একটা ঝুপড়িতে ঢুকে চা আর রুটি খেলাম আমরা। বেরিয়ে দেখি তখনও বরফ পড়ছে। সঙ্গে শুরু হয়েছে হাওয়া। আরও কিছুটা ওপরে উঠতেই হাওয়া ও বরফ বেড়ে গেল। প্রথমে বরফের কুচি দেখে আনন্দে নেচে উঠেছিলাম। কিন্তু একটু পরেই বরফ এত জোরে পড়তে শুরু করল যে, আমরা সবাই বেশ ঘাবড়ে গেলাম। সামনে বরফ-ঢাকা রাস্তা। কোথাও কোনো আশ্রয় নেই, কোনো লোক নেই। পথ খুঁজে পাচ্ছি না। সবশেষে ইম্‌জাখোলা নদী দেখে এগিয়ে গেলাম। তার একটু পরেই ফেরিচের (১৩,৯২২ ফিট) বরফে-ঢাকা সাদা ঘর-বাড়ি নজরে পড়ল। বাঁচলাম আমরা। একটা হোটেলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম আমরা।

২৩ অক্টোবর

আজ আরও এগিয়ে যাবার কথা ছিল। কাল থেকে সমানে বরফ পড়ে চলেছে। এখন সকাল দশটা, বাইরে ছ-ইঞ্চির ওপর বরফ। কিছুক্ষণ পরে দেখি লোবুচে থেকে সবাই নেমে আসছে। ওদের কাছে শুনলাম কাল থেকে বরফ পড়ে লোবুচে এখন তুষারে ডুবে আছে। বরফ এখনও পড়ছে। আমাদের হোটেলটা কিছুক্ষণের মধ্যেই লোবুচে-ফেরত ট্যুরিস্টে ভরে উঠল। বাইরে বরফ পড়ে চলেছে। আমি আর বাবা হোটেল থেকে স্নো-বুট ভাড়া করে বাইরে

বরফের মাঝখানে মল্লিতা।

থেকে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে এলাম। অদ্ভুত দৃশ্য, অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। চারদিকের আকাশ, মাটি, বাতাস—সব সাদা আর সাদা। তুষারঝড় বইছে। বেশি দূরে যেতে পারলাম না। আমার পা হাঁটু পর্যন্ত বরফে ডুবে যাচ্ছিল। রেনকোট পরে কয়েকজন বিদেশী ট্যুরিস্ট তখন আমাদের হোটেলের সামনে স্নো-ম্যান বানাতে ব্যস্ত। তার নাম দেওয়া হল 'ইয়েতি'।

এখন বিকেল ছ'টা। বরফ পড়ার কোনো শেষ নেই। আমরা বেশ ভয় পেয়ে গেছি। বাইরের পথ-ঘাট বরফে ঢেকে

যাচ্ছে। আজ থেয়াংবোচ থেকে কোনো ট্যুরিস্ট আসেনি। সব এসেছে ওপর থেকে। সন্ধে সাতটায় বরফ পড়া বন্ধ হল। রাত আটটায় আকাশ পরিষ্কার। বাইরে অপূর্ব দৃশ্য। ফেরিচে এখন চাঁদের আলোয় যেন এক পরির দেশ। চারপাশের বরফ ও পাহাড়ে আবছা নীল আলো ছেয়ে আছে।

২৪ অক্টোবর

আবহাওয়া আজ চমৎকার। আকাশে ছিটেফোঁটাও মেঘ নেই। কিন্তু মাটির ওপর এক ফুটেরও বেশি উঁচু বরফ থাকায় প্রায় সবাই নীচে নেমে যাচ্ছে। আমাদের কুলিও আর যেতে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত তাকে অনেক বুঝিয়ে, বখশিসের কথা বলে আমরা এগোলাম। সকাল আটটা। লোবুচের জন্য আমরা ছাড়া ফেরিচে থেকে বার হল আর মাত্র আটজন বিদেশী। হাঁটুডোবা বরফ ভেঙে হাঁটছি। এভারেস্ট '৮২-র স্প্যানিশ টিমের ইয়াকগুলো এই পথে গেছে। বরফের ওপর তাদের পায়ের ছাপ। তার ওপর দিয়ে হাঁটছিলাম আমরা। তবে বরফের জন্য প্রথম চড়াইটা পেরুতে বেশ কষ্ট হল। তারপর খুম্বুখোলা নদী পেরিয়ে পেলাম বরফে-ঢাকা একটা ঝুপড়ি। চা, নুডুল্‌স খেয়ে বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষণ। এবার চড়াই বেশ খাড়া। চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ। দুপুরের রোদ ঝলসে উঠছিল তার ওপর। চোখে গগ্‌ল্‌স থাকা সত্ত্বেও এদিক-ওদিক তাকাতে পারছিলাম না। চারদিকে শুধু বরফ, বসার মতো জায়গা কোথাও নেই। ওপরের চড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে ভয়ে শিউরে উঠলাম। অনেক কষ্টে সেই চড়াই পেরিয়ে বিকেল সাড়ে-তিনটের সময় লোবুচেতে (১৬,১৭৩ ফিট) পৌঁছলাম। আমাদের অবস্থা তখন বেশ খারাপ।

২৫ অক্টোবর

মাইনাস পাঁচ ডিগ্রির কঠিন রাতটা কোনোমতে কাটল। সকাল আটটায় দুপুরের খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে রওনা

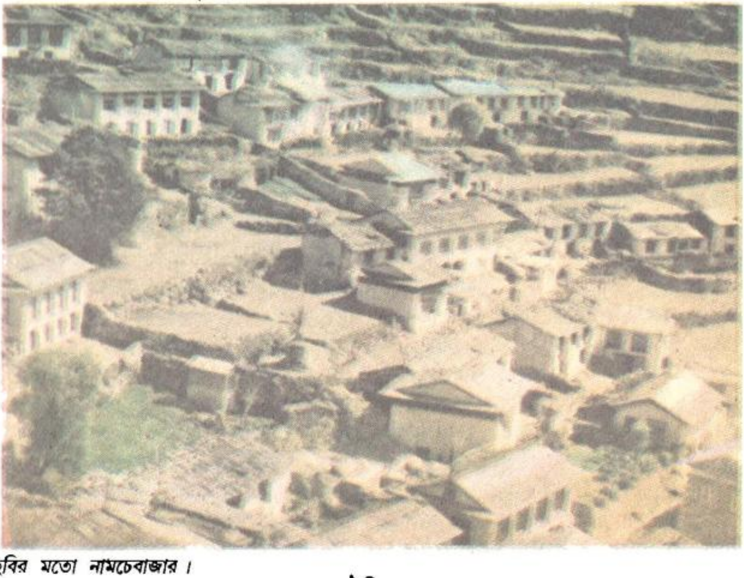

ছবির মতো নামচেবাজার।

হলাম কালাপাথারের দিকে। চারপাশে সেই বরফ আর বরফ। আর তুষার-ঢাকা পাহাড়। গোরকশেপে (১৭,০৬০ ফিট) পৌঁছলাম সকাল এগারোটায়। সেখানকার একমাত্র ছোট্ট ঝুপড়িতে চা-বিস্কুট খেলাম। ঝুপড়ির বাঁদিকে কালাপাথার। ডানদিকে এভারেস্টের চূড়ার একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। আমরা এগোলাম। অন্য ট্যুরিস্টরা আগেই এগিয়ে গেছে। ওদিকে খুম্ব গ্লেসিয়ার।

কালাপাথারের দিকে এগোচ্ছি আমরা। হঠাৎ ফেরিচেতে পরিচিত শেরপা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তাঁর কথামতো ঘোরা-রাস্তায় না এগিয়ে সোজাসুজি খাড়া পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। একটু ওপরে উঠে দেখি, ডানদিকে নীচে পাতলা তুষারে ঢাকা ছোট্ট লেক। কালাপাথারের নরম মাটিতে পাথর কম বলে উঠতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। মাঝে-মাঝে পা ডুবে যাচ্ছিল বরফে। একটু পরেই আবার আমার সেই মাথাব্যথা শুরু হল। পা আর চলতে চাইছে না। অনেক কষ্টে কালাপাথারের প্রথম টপে উঠলাম।

আমাদের একেবারে সামনে এভারেস্ট মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুপাশে নুপ্‌সে ও লোত্‌সে। পেছনে নীল আকাশ। অপূর্ব দৃশ্য। শরীর অসম্ভব খারাপ লাগলেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম মাটির ওপর। মাউন্টেন সিকনেস আমাকে পুরোপুরি কাবু করে ফেলেছে। বাবা ছুটে এল আমার কাছে। একটু পরেই বাবা আমাকে নিয়ে নামতে শুরু করল। আমার তখন খুব কাহিল অবস্থা। ঘোরের মাথায় নামছি। একটু নামছি আর বসছি। এইভাবে অনেক কষ্টে লোবুচেতে পৌঁছেই শুয়ে পড়লাম ঝুপড়ির বিছানায়।

<u>২৬ অক্টোবর</u>

কালাপাথ্থারে ওঠা হল। সেখান থেকে এভারেস্টও দেখলাম। মন তাই আনন্দে

"নামচেতে এসে আমার অসম্ভব মাথাব্যথা শুরু হয়েছিল। পাশে দাঁড়িয়ে মা।"

ভরপুর। কিন্তু ফিরতে হবে এবার। সকাল আটটার একটু আগেই ফেরিচের দিকে নামতে শুরু করলাম। বরফের ভয়ংকর তাড়ায় মাত্র চার ঘন্টায় পৌঁছে গেলাম ফেরিচে। সেখানে চটপট লাঞ্চ সেরে আবার হাঁটা। বিকেল সাড়ে-চারটেয় দুদিনের ট্রেকিং শেষ হল একদিনে। আমরা থেয়াংবোচে পৌঁছে গেলাম। থেয়াংবোচে বরফ নেই। হঠাৎ মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। আর কখনো কি এত কাছ থেকে এভারেস্টকে দেখতে পাব? ফেরার পথে বারবার মনে পড়ছিল অপরূপ এভারেস্টের কথা।

গিরিধারী কুণ্ডু

এবং

দুটি মনের মতো বই

গিরিধারী কুণ্ডু দুটি চমৎকার বই লিখেছেন তোমাদের জন্য। একটির নাম 'টংসা চু'। ভূটানের নদী টুংসা, আদর করে সবাই ডাকে টংসা। সেই নদীকে ঘিরে ছবির মতো দেশ ভূটানকে নিয়ে দারুণ-দারুণ সব গল্প এই বইতে। এই বইটি একটি পুরস্কারও পেয়েছে। অন্য বইটি উপন্যাস। নাম 'রাত একটা'। নাম শুনেই বোঝা যায় রহস্য রোমাঞ্চ মিশে আছে, তাই না? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। দার্জিলিঙের পটভূমিকায় এই রহস্য কাহিনীর শুরু সেই ট্রেনে যাবার সময় থেকেই। এক নিখোঁজ শিকারী ও বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল নিয়ে 'রাত একটা' এক দুর্ধর্ষ উপন্যাস।

গিরিধারী কুণ্ডুর বই

রাত একটা ৪·০০

টংসা চু ৬·০০

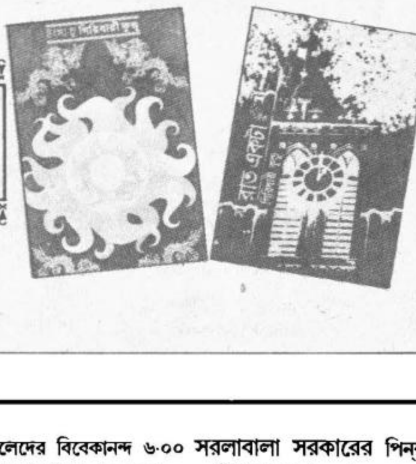

আরো অনেক বই

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছেলেদের বিবেকানন্দ ৬·০০ সরলাবালা সরকারের পিনকুর ডাইরি ৩·০০ মৌমাছির (বিমল ঘোষ) রাজার রাজা ১০·০০ শৈলেন ঘোষের অরুণ বরুণ কিরণ মালা ৪·০০ মিতুল নামে পুতুলটি ৬·০০ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৭·০০ বাজনা ৬·০০ হুলোকে নিয়ে গপ্পো ৮·০০ আমার নাম টায়রা ৬·০০ আজব বাঘের আজগুবি ৭·০০ জাদুর দেশে জগন্নাথ ৮·০০ স্বপ্নের জাদুকরী ৭·০০ শঙ্করীপ্রসাদ বসুর আমাদের নিবেদিতা ৬·০০ প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগ্রা যখন টলমল ৫·০০ যাঁর নাম ঘনাদা ৭·০০ ঘনাদার ফুঁ ৮·০০ তেল দেবেন ঘনাদা ৬·০০ ছড়া যায় ছড়িয়ে ৫·০০ সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত সেরা সন্দেশ ৬০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

বিজ্ঞানবিচিত্রা

পূর্ণিমায় অপরাধ

চন্দ্রকলার সঙ্গে পাগলামিও যে বাড়ে কমে—এ বিশ্বাস প্রাচীনকালেই ছিল। তাই পাগলের একটি ইংরাজি প্রতিশব্দ 'লুনাটিক' এসেছে 'লুনা' বা চাঁদ থেকে। ব্যাপারটা আজকের মনোবিজ্ঞানীদেরও বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

শিকাগোর ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রালফ. ডব্লু. মরিস সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, অন্যান্য তিথিতে আগুন লাগানোর যত ঘটনা ঘটে, পূর্ণিমায় ঘটে তার প্রায় দ্বিগুণ। অ্যারিজোনার দমকল বাহিনীও স্বীকার করেছে যে, পূর্ণিমার দিন অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা অন্যান্য দিনের চেয়ে অন্তত ২৫টি বেশি।

নিউ ইয়র্কের আর একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পূর্ণিমায় খুনের ঘটনাও বেড়ে যায় শতকরা ৭৩ ভাগ। কুখ্যাত খুনী ডেভিড মার্কোভিজ ওরফে 'সন্ অব্ স্যাম'-এর মাথায় রক্ত চড়ে যেত পূর্ণিমা এলেই। যে আটটি রাত্রিতে সে রক্তবন্যা বইয়ে দিয়েছিল তার মধ্যে পাঁচটিই ছিল পূর্ণিমার রাত ও বাকি তিনটি পূর্ণিমার দু-এক দিন আগে ও পরে।

আর একটি সমীক্ষা চালিয়েছেন পাটনা মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররা। তাঁরা দেখেছেন যে, বিষপ্রয়োগে হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনার সংখ্যাও পূর্ণিমাতে অনেক বেশি।

আভাস যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, এবার থেকে পুরোহিতের মতো পুলিশকেও ঘন-ঘন পঞ্জিকা ঘাঁটতে হবে।

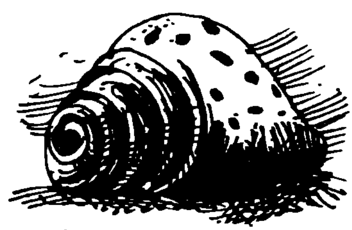

দিনরাত্রি বড় হচ্ছে

ক্যালিফোর্নিয়ার বোডেগা মেরিন ল্যাবরেটরির রিচার্ড. এম. বার্কার শামুকের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছেন। এক ধরনের শামুকের খোলার গায়ে সামুদ্রিক ক্যালসিয়াম জমে জমে গোল গোল দাগ পড়ে। প্রতিদিন প্রকৃতি এইসব জীবিত শামুকের খোলায় একটা করে বিশেষ দাগ এঁকে দেয়। এখন প্রতি বছর এদের খোলার ওপর ৩৬৫টি নতুন দাগ পড়ে। প্রত্যেক বছরের বাৎসরিক বলয়সমষ্টির রঙ একটু আলাদা বলে কোন্ বছরের কটা বলয় বা দাগ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এই ঘটনাটি নিশ্চিত জানার পর বার্কারের হাতে এসেছে ৮ কোটি বছর আগেকার এই ধরনের শামুকের খোলা। এর বাৎসরিক বলয়সমষ্টিতে ৩৭৬টি দাগ দেখা গেছে। অর্থাৎ, তখন বছরে ছিল ৩৭৬ দিন। আবার উনি ৩৯ কোটি বছর আগেকার শামুকের খোলার বাৎসরিক স্তরে দেখতে পেরেছেন ৩৯৯টি দাগ। অর্থাৎ ৩৯ কোটি বছর আগে ৩৯৯ দিনে এক বছর হত বা প্রতিটি দিন ছিল প্রায় ২২ ঘন্টা।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. থমসন চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের গতিবেগ এবং মাধ্যাকর্ষণ হিসেব করে বলেছেন যে, বার্কারের তত্ত্ব ভুল নয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে গড়ে একশো বছরে দুই মিলিসেকেণ্ড (সেকেণ্ডের হাজার ভাগের দু ভাগ) হারে দিনরাত্রির দৈর্ঘ্য বেড়েছে।

চঞ্চল পাল

অলৌকিক আধুলিরহস্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ইদানীং রোজ ভোরবেলা জগিং শুরু করেছি। আমাদের এই ছোট্ট শহরে অত সকালে রাস্তাঘাট একেবারে নিরিবিলি হয়ে থাকে। তাতে শীতকাল। খেলার মাঠ পেরিয়ে নদীর ধার অব্দি গিয়ে বাড়ি ফিরতে এক কিলোমিটার দৌড় হয়ে যায়। গা ঘেমে ওঠে।

আমার ভাগ্নে শ্রীমান ডন টের পেয়ে একদিন বলল, "চোরটাকে ধরতে পেরেছিলে মামা?"

"চোর? কোথায় চোর?" আকাশ থেকে পড়লুম। "আমি তো জগিং করছিলুম, হতভাগা! চোর কোথায় দেখলি?"

ডনও আকাশ থেকে পড়ল? "জগিং! ও মামা, জগিং মানে কী? তুমি তো দৌড়চ্ছিলে।"

গম্ভীর হয়ে বললুম, "জগিং মানে দৌড়ব্যায়াম। এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। খিদে বাড়ে। জম্পেশ রকমের ঘুম হয়।"

ডন খুশি হয়ে বলল, "আমিও জগিং করব, মামা!"

"বেশ তো। ভোর ছটায় ঘুম থেকে উঠিস। তোর তো সাতটার আগে ঘুমই ভাঙে না।"...

পরদিন অবশ্য ওকে বিছানা থেকে টেনেই ওঠাতে হল। কিন্তু অতটুকু ছেলে। খেলার মাঠ অব্দি গিয়ে "ধুস্" বলে নেতিয়ে বসল। আমি হাসতে-হাসতে ধুকুর-ধুকুর দৌড়ে নদীর ধারে রোজকার টারগেট পোড়োমন্দির চক্কর দিলুম। তারপর খেলার মাঠে এসে দেখি, ডন ফের পুরোদমে শুরু করেছে। মনেমনে বললুম, ভাল! বাহাদুর ছেলে!

তারপর টের পেলুম ব্যাপারটা। ডন আসলে পাড়ার সেই বদরাগী নেড়ি কুকুরটাকে উচিতশিক্ষা দিতে চলেছে। তার হাতে আধলা ইট। কুকুরটা লেজ গুটিয়ে ঝিলের ধারে রামু ধোপার গাধার পেটের তলা দিয়ে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইতে বুঝি গাধাটা অপমানিত বোধ করে চার ঠ্যাং তুলে লাফ দিল। তখন শ্রীমান বেগতিক দেখে থমকে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে বললুম, "খুব হয়েছে! তোমার দ্বারা জগিং-টগিং হবে না। বাড়ি এসো।"

ডন ফিক করে হেসে বলল, "তখন অমন বসে পড়লুম কেন বলো তো মামা?"

"দৌড়ুতে পারছিলে না বলে।"

ডন বলল, "যাঃ! সেজন্যে নাকি! একটা আধুলি পড়ে ছিল যে ওখানে।"

সে আধুলিটা দেখাল। চকচকে নতুন আধুলি। বললুম, "কার পড়ে-টড়ে গেছে আর কী? তুই ওটা দিয়ে যদি ফের ঘুড়ি কেনার মতলব করিস, গাঁট্টা লাগাব বলে দিচ্ছি। গাছে ঘুড়ি আটকাবে আর আমাকে গাছে চড়তে হবে—কক্ষনো না।"

ডন মনমরা হয়ে বলল, "তাহলে কী

করব বলো না মামা?"

"বরং কোনো ভিখিরিকে দান করে দিস। পুন্যি হবে।"

বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলুম, শীতের রোদে রাস্তার মোড়ে সেই অন্ধ ভিখিরিটা বসে আছে—রোজই থাকে। ডনকে ইশারা করলে সে গম্ভীর মুখে আধুলিটা ভিখিরির মগে ঠকাস করে ফেলে দিয়ে এল। বোঝা যাচ্ছিল, আধুলিটা নিয়ে তার অন্য কোনো মতলব ছিল।

সন্ধ্যায় এক কাপ চা নিয়ে আরাম করে বসে একটা গোয়েন্দাগল্পের পাতায় চোখ রেখেছি, ডন এসে বলল, "মামা, ও মামা!

দ্যাখো, দ্যাখো—সেই আধুলিটা না ?"

ডনের হাতে একটা আধুলি ছিল। সেটা পড়ে-পাওয়া আধুলিটার মতোই নতুন এবং চকচকে বটে। বললুম, "সেই আধুলিটা, কী বলছিস ? ওটা তুই তো ঠকাস করে ভিখিরির মগে ফেললি সকালে।"

ডন চোখ বড় করে বলল, "অবাক মামা, অবাক ! পিসিমা একটা টাকা দিয়েছিল আমাকে জানো তো ? টাকাটা নিয়ে গেলুম হাবুবাবুর দোকানে খাতা কিনতে। এই দেখো না খাতাটা।"

সে খাতাটা দেখাল। বিশ্বাস করে বললুম, "আধুলিটা বুঝি হাবুবাবু দিলেন ?"

ডন চাপা গলায় বলল, "দিলেন তো ! ও মামা, এটা সেই আধুলিটা—সত্যি বলছি, দ্যাখো না ভাল করে। ঠিক সেইটে। কুড়িয়ে পেয়ে কতক্ষণ ধরে দেখেছিলুম না ? সেই লাল ফুটকিটা পর্যন্ত। দেখতে পাচ্ছ ?"

তর্ক করে লাভ নেই ওর সঙ্গে। ঝামেলা বাড়বে। হাত বাড়িয়ে বললুম, "ওটা আমায় দে। তার বদলে তোকে আট আনা দিচ্ছি।"

ডন একপা পিছিয়ে বলল, "উঁহু ! এটা দিয়ে আমি ম্যাজিক করব না বুঝি ?"

"বেশ, তাই করিস। যা এখন।"

ডন বলল, "তুমি বিশ্বাস করলে না তো ? ঠিক আছে। কাল ভোরবেলা জগিং করার সময় ফের এটা ভিখিরিকে দেব। দেখবে, ফের ঘুরে আসবে আমার হাতে।"

পরদিন ওকে ঘুম থেকে ওঠাতে হল না। আমাকেই বরং ওঠাল। মামা-ভাগ্নে মিলে ঠাণ্ডাহিম ভোরবেলায় ধুকুর-ধুকুর দৌড় শুরু করলুম। আজ ওর খাতিরে একটু আস্তে। নদীর ধারে পোড়োমন্দির ঘুরে খেলার মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছে লক্ষ করলুম, শ্রীমান একটুও কাবু হয়নি। রহস্যটা কী ?

মোড়ের অন্ধ ভিখিরিকে দেখে আধুলিটার কথা মনে পড়ল। বললুম, "হ্যাঁ রে, আধুলিটা ওকে দিবি বলেছিলি যে ?"

"দিচ্ছি।" বলে ডন ভিখিরির কাছে গেল।

ঠকাস শব্দ এবং ভিখিরির আশীর্বাদ শুনে বুঝলুম, মুদ্রাটি যথাস্থানে গেছে।

এদিন ছিল রবিবার। ডন একদফা পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছিল। এগারোটা নাগাদ তার পায়ের ধুপধুপ আওয়াজ শুনলুম। তারপর এক চিক্কুর—"মামা ! মামা ! ম্যাজিক মামা, ম্যাজিক !" তারপর হাঁফাতে-হাঁফাতে ঘরে ঢুকে সে বলল, "বলেছিলুম না ? এই দ্যাখো।"

ওর হাতে সেই আধুলিটার মতোই চকচকে নতুন আধুলি দেখে হাসতে হাসতে বললুম, "চালাকি ? কোত্থেকে নতুন একটা আধুলি এনে বলছ সেইটে ?"

ডন কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "তোমার দিব্যি, মামা ! মা পান কিনতে পাঠিয়েছিল। পানঅলা এটা দিল। সে আমার হাতে ওটা গুঁজে দিল। তুমি দেখে রাখো না ! এই লাল ফুটকিটা দেখছ—ওই দেখেই তো চিনতে পারছি।"

"ঠিক আছে। আমার কাছে থাক এটা। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখব'খন।"

ডন ছোঁ মেরে আধুলিটা তুলে নিয়ে ছিটকে সরে গেল। রাগী মুখ করে বলল, "দিচ্ছি তোমায় ! অত করে মার কাছে বকুনি খেয়ে এটা ফিরে পেলুম। এ দিয়ে ম্যাজিক করব।"

পরদিন ভোরে জগিং করতে গিয়ে নদীর ধারে পোড়োমন্দির চক্কর দিচ্ছি, হঠাৎ খেয়াল হল শ্রীমান সঙ্গে নেই। ঘুরে দেখি, অনেকটা দূরে খেলার মাঠে ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতেই ভ্যাঁ করে বলল, "আধুলিটা হারিয়ে গেছে মামা !"

রাগ করে বললুম, "বেশ হয়েছে হতভাগা ছেলে ! আধুলি হাতে নিয়ে কেউ দৌড়য় ?"

ডন আমাকে খামচে ধরে থামাল। তারপর চোখ মুছতে-মুছতে বলল, "খুঁজে

দাও না মামা। আমার ম্যাজিক করা হবে না যে!"

ঘাসে শিশির চকচক করছে। সূর্যটা সবে যেন বিছানা থেকে উঠে বসে হাই তুলছে। পিটপিটে চাউনি। তার ওপর উত্তুরে হাওয়ার ঠাণ্ডাহিম দুষ্টুমি। এমন সময় একটা আধুলি খুঁজে বের করা বড় কষ্টসাধ্য কাজ। ডনের খাতিরে তবু অনেক কষ্ট করতে হল। কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। ডনকে বললুম, "ঠিক এখানেই পড়েছে তার মানে কী? অন্য কোথাও ফেলেছিস তাহলে।"

ডন জোরের সঙ্গে বলল, "এখানেই।"

কিন্তু প্রচণ্ড খুঁজেও আধুলিটা পাওয়া গেল না। কাজেই আমাদের পায়ের শব্দে রাস্তার মোড়ের অন্ধ ভিখিরি নড়েচড়ে বসলেও তার মগে ঠকাস করে সেই মিঠে শব্দটা বাজল না। বেচারা নিশ্চয় খুব মনমরা হয়ে গেল।

মনমরা হয়ে রইল শ্রীমানও। শরীর খারাপ বলে স্কুলে গেল না। বিকেল নাগাদ ভাবলুম, ছেলেটাকে চাঙ্গা করা উচিত। আমার ডাক শুনে ডন চোখ পিটপিট করে ঘরে ঢুকল। তারপর নিজের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী?"

ওকে টেনে আদর করে বললুম, "যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। চল্, বাইরে কিছুক্ষণ ঘুরে আসি। মন ভাল হয়ে যাবে।"

ডন ঘাড় গোঁজ করে বলল, "যাব—একটা আধুলি দাও। নতুন আধুলি না হলে নেব না কিন্তু।"

"আধুলি?" চিন্তিত হয়ে বললুম। "আধুলি যদি না থাকে, দুটো সিকি হলে চলবে না?"

ডন ঠোঁটের কোনায় কেমন একটু হাসল। "তোমার টেবিলের ড্রয়ার খুঁজে দ্যাখো না।"

টেবিলের ড্রয়ারে খুচরো পয়সা রাখি, একথা সত্য। ডনের এ খবর অজানা থাকার কথা নয়—এবাড়ির কারুরই নয়। খুঁজতে গিয়ে পেয়েও গেলুম একটা আধুলি। এবং চকচকে আনকোরা আধুলিটা। ডনের তর সইল না। খপ্ করে কেড়ে নিল। তারপর উলটে-পালটে দেখতে দেখতে আচমকা এক চিল-চিক্কুর ছাড়ল, "মামা, ও মামা! ম্যাজিক মামা ম্যাজিক!"

অবাক হয়ে বললুম, "কী রে?"

"সেই লাল ফুটকিটা।" ডন নাচতে নাচতে বলল। "আমার আধুলি! আমার আধুলি! দ্যাখো, দ্যাখো!"

হাঁ করে তাকিয়ে ছিলুম। ওর হাত থেকে মুদ্রাটা নিয়ে আরও অবাক হলুম। এ কী! সত্যি সেই লাল ফুটকিঅলা আধুলিটা যে! কোথায় পেলুম এটা—কার কাছে, কিছুতেই মনে পড়ল না। কিন্তু জিনিসটা যে অলৌকিক এতে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আর এও ঠিক যে, এই পড়ে-পাওয়া অলৌকিক আধুলি যখন ডনকে ভালবেসে ফেলেছে, তখন ডন এটা মোড়ের অন্ধ ভিখিরিকে দিক কিংবা হারিয়ে ফেলুক, আবার তার কাছে এ-হাত সে-হাত ঘুরে ফিরে আসবেই। নিজেকে চেনাবার জন্য কপালে একটা লাল ফুটকি তো থাকবেই। সুতরাং ডন দৌড়ে বেরিয়ে গেলে ওর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। এমন ভাগ্নের মামা হওয়াটাও তো কম গর্বের কথা নয়।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ডি এইচ লরেন্স যখন বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যুর আর দেরি নেই, তখন তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, এবার আমি একটু ভাল বোধ করছি।

ফ্ল্যাশ গর্ডন

উপগ্রহগুলি এককাট্টা হয়ে লড়ে না কেন ?
আমার বাবা মিংকে ওরা ভয় পায় ।
চিন্তাযন্ত্রে এবারে বারিনকে ডাকব ।
বোতাম টিপতেই অরার মাথায় নামল প্লাস্টিকের টুপি...
এই চিন্তাযন্ত্রে ডেলের সঙ্গেও কথা বলা যায় ?
নিশ্চয় ।
কিন্তু বলতে দেব না ।
বটে ?
কী করছ ফ্ল্যাশ ? দুর্ঘটনা ঘটবে !
অরার হাত থেকে কন্ট্রোল কেড়ে নিয়েছে ফ্ল্যাশ...
বোকা ! আমরা যে ফ্রিজিয়া উপগ্রহে নামছি !
ডেলকে চিন্তাযন্ত্রে ডাকো !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

দারোগার দুর্নীতি দমন

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বিপিন খাস্তগীর ডাকসাইটে দারোগা। চোর-ডাকাত খুনে-বদমাসের চেয়ে থানার পুলিশরাই বিপিন দারোগাকে বেশি ভয় করে। সকালে উঠে দারোগাবাবু গীতা পাঠ করেন, প্রতিদিন বাজার থেকে ব্রাহ্মি শাক আর কুলেখাড়া শাক কিনে আনেন। লক-আপের মধ্যে আসামি বমি করলে তাড়াতাড়ি উঠে তাকে নাক্স ভমিকা দেন, বলেন, "রোজ একটু করে তেতো শাক পাতা খাবে। ওতে মুড়ি আর ভুঁড়ি দুই-ই ঠাণ্ডা থাকে। বুঝলে?"

একবার তাঁর সামনে একজন পকেটমারকে ধরে এনে থানার এক কনেস্টবল তাকে গালমন্দ করছিল, বিপিন দারোগা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "রামো রামো! এসব কী ভাষা। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে তিনটে করে তুলসীপাতা চিবিয়ে খেও।"

গোপালপুর থানায় বদলি হয়ে এলেন বিপিন দারোগা। এই থানার খুব দুর্নাম, তাই ওপরওলারা ওঁকে পাঠিয়েছেন। কাজকর্ম বুঝে নিয়ে নতুন দারোগাবাবু জানতে চাইলেন, "পারশনাথ মিশির কার নাম?"

নতুন দারোগার সামনে থানার কনেস্টবলরা উর্দি-পেটি এঁটে লাইন করে দাঁড়িয়েছিল। সব চেয়ে মোটা মানুষটি এক কদম এগিয়ে এসে বুট জুতোর গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে দাঁড়াল, বলল, "হুম হজৌর।" গলা কেঁপে গেল পারশনাথের। বুঝল আগেই তার সম্পর্কে সব জেনেশুনে এসেছেন দারোগাজি। পুলিশ মহলে

পারশনাথ একটি কিংবদন্তি। জেলার সব থানা-ফাঁড়িতেই এক-আধ বছর করে থেকে এসেছে। জ্বালিয়ে মেরেছে ওপরওলাদের। ওর বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকেদের নানা অভিযোগ, পুলিশ সুপারের কাছেও দরখাস্ত গেছে। তিনি সেবার ডাকিয়ে পাঠালেন পারশনাথকে। জিজ্ঞেস করলেন, "বয়স কত হল?"

পারশনাথ বলল, "পঁয়ত্রিশ, স্যার।" সুপার চমকে উঠলেন, গোঁফ একটাও কাঁচা নেই, গোটা-পাঁচেক দাঁত পড়ে গেছে, মাথায় টাক, বলে কী লোকটা! সুপার কথা বাড়ালেন না, তিনি জানেন ভর্তির সময় এরা আজেবাজে বয়স লেখায়। শরীর স্বাস্থ্য শক্ত দেখে কেরানিবাবুরাও তাই লিখে নেয়। কিন্তু তাই বলে এতটা হেরফের হওয়ার কথা নয়। কোথায় কী কারচুপি করেছে কে জানে। সুপার বললেন, "এবার নৌকরি থেকে বসে পড়ো তোমার ছেলেকে আমি ঢুকিয়ে দেব।"

পারশনাথ একটু অস্বস্তিতে পড়ল। সাহেব যেচে বলছেন, ছেলেটা খেতি-উতি নিয়ে আছে, সিপাহিতে ভর্তি হলে ভালই হত। কিন্তু—

বলল, "আপনার মেহেরবানি স্যার। লেকিন একটা গলদ রয়ে গেছে স্যার। লড়কা আমার একটা পাশ দিয়ে দিয়েছে।"

"তা হলে তো ভালই।" সুপার বললেন, "ছেলের বয়স কত হল?"

পারশনাথ কাচুমাচু হয়ে বলল, "ও আমার থেকে বড় স্যার।"

"সে কী!" ছোটবেলায় অঙ্ক করেছেন, পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ হইলে—

পারশনাথ বলল, "ওর কোই কসুর নেই স্যার। ওর ঠিক-ঠিক ছত্রিশ সাল হল। সার্টিফিকিট আছে।"

সুপার বললেন, "বাপের বয়স পঁয়ত্রিশ, ছেলের বয়স ছত্রিশ। হোয়াট ননসেন্স!"

পারশনাথ বলল, "ভর্তির সময় আপনা উমর জ্যাদা কম করে ফেলেছে স্যার। আনপড় আদমি। এখন তো সার্ভিস বুকে রিকর্ড হয়ে গেছে।"

সুপার ধমকে বললেন, "তোমার নামে নানারকম শুনছি। ঠিক-ঠিক কাজ না করলে বয়স ভাঁড়াবার অপরাধে ডিসমিস করে দেব। মনে থাকে যেন।"

তাতেও সংশোধন হয়নি পারশনাথ। ওর জন্যে এই গোপালপুর থানারও খুব দুর্নাম হচ্ছে। সিনেমা হলে ডিউটি পড়লে ম্যানেজারকে বলে হলে ঢুকে সিনেমা দেখতে বসবে, তারপর বাইরে এসে এমন একজনকে ধরবে যে টিকিট পায়নি। টিকিটের অর্ধেক দাম নিয়ে তাকে বসিয়ে দেবে নিজের সিটটিতে। রাস্তায় ট্রাফিক ডিউটি পড়েছে, ধরল একটা গাড়ি, পেছনে লাল বাতি জ্বালেনি ড্রাইভার। পাঁচ আইনের কেস। পকেট থেকে নোটবই আর পেনসিল বের করল পারশনাথ, ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এ বাবুয়া, লিখ গাড়িকা নম্বর, আপনা নামভি।" ড্রাইভারও তেমনি। বলল, "আমি লিখতে যাব কেন! লিখতে হয় আপনি লিখুন।" গাড়ির নম্বর বলল, নামও বলল।

পারশনাথ সামান্য অপ্রস্তুত হল। তারপর গোঁফে মোচড় দিয়ে বলল, "হম লিখি তো সাজা জরুর ভৈ। ভালা চাহ ত' লিখহ।" ড্রাইভার কিছুতেই লিখবে না, পারশনাথও ছাড়বে না। ড্রাইভার একটু হেসে বলল, "আমি লিখতে জানি না।" পারশনাথও জানে না, কিন্তু সে-কথা বলা চলে না। সরকারি নোটবুক আর পেনসিল পকেটে পুরে বলল, "তব চলো থানা, অব তো দরোগাবাবু লিখবে।" সুতরাং এবার ওর সঙ্গে একটা রফা করে ছাড়া পেল ড্রাইভার।

নতুন দারোগা বিপিন খাস্তগীরের সামনে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে পারশনাথ। পাশাপাশি আর যারা আছে তারা ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে।

ডানদিকের একজন চাপা গলায় বলল, "পা কাঁপছে পারশনাথজি।"

বিপিন দারোগা প্রথমদিনই অর্ডার করে দিলেন, পারশনাথ মিশির বাইরে ডিউটি করবে না। বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। এরকম একজন পহলবন লোকই আমার দরকার।"

বছরখানেক যেতে না যেতে প্যাণ্টুল ঢিলে হয়ে গেল পারশনাথের। মুখ ছিল মস্ত ডাবের মতো, হয়ে গেল ঝুনো নারকেল।গোঁফ ছিল তার ওলটানো সেকেণ্ড ব্রাকেটের মতো, লতিয়ে নুয়ে পড়ে হয়ে গেল প্রথম বন্ধনী। এসব দেখেও মনে দয়া হল না দারোগার। থানায় কোনো দুর্নীতি হতে দেবেন না তিনি।

বসে বসে পা ধরে গেল পারশনাথের। শুখা বেতনের ওপর ভরসা। আগে লোক থানায় এলে না চাইতেই কিছু দিয়ে যেত, এখন নতুন দারোগার ভয়ে লোকে তাও দেয় না। দারোগাবাবু বলেন, ঘুষ দেওয়া নেওয়া দুই-ই অপরাধ। সুতরাং পুজোপাঠ আর তুলসীদাসী রামায়ণে মন দিল পারশনাথ।

এমন সময় একদিন রাত্তিরে থানায় খবর এল জেলখানায় এক কয়েদি মারা গেছে, তার বাড়ি এই থানার এক দূর গ্রামে, সেখানে খবর দিতে হবে মৃতের আত্মীয়স্বজনকে। দুর্গম রাস্তায়, হাঁটা ছাড়া গতি নেই। দিনমানে হলে মাইলদশেক যাওয়া যেত বাসে। সে বাস তো বন্ধ হয়ে গেছে রাত সাতটার পরেই। এই রাত্তিরে বেরুলে যেতে যেতে ভোর হয়ে যাবে। সব কনেস্টবলই ডিউটি করে ক্লান্ত, শুধু বসে খাচ্ছে পারশনাথ। বিপিন দারোগা তাই এ-কাজে ওকেই পাঠালেন। কয়েদি আর মরার সময় পেল না! পারশনাথ বুঝল এ এক শুকনো ঝামেলা, শোকের ব্যাপার। তবু যেতে হল। সহকর্মীরা মজা দেখছে। মুখে সহানুভূতি দেখাচ্ছে, গুম হয়ে বসে পায়ে খাকি পটি জড়াচ্ছে পারশনাথ।

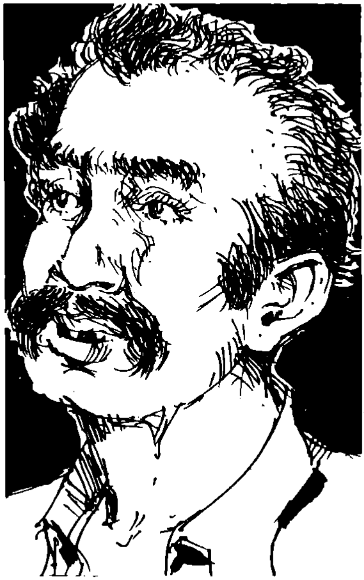

একজন হঠাৎ নিজের সাইকেলটা নিয়ে এসে হাজির হল, বলল, "এটা নিয়ে যান মিশিরজি।" পারশনাথ সাইকেল চড়তে জানে না, তবু শান্তভাবে সাইকেলটা নিল, হ্যান্ডেলটা ধরে খানিকটা হেঁটে আবার ফেরত দিয়ে বলল, "নহি বাবুয়া, সাইকেল চড়না ডাগদার কো মানা হ্যায়।"

পথে যেতে যেতে অনেক রকম বুদ্ধি মাথায় এল। যাতায়াত বাবদ সরকারি রাহা খরচ মিলবে, কিন্তু সে আর কতটুকু। রাত্তিরে যাওয়া, দোকানপাট বন্ধ, কোথাও যে এক কাপ চা বিশ পয়সায় খাবে তার উপায় নেই। শহর পেরিয়ে এসে চারদিক অন্ধকার সুনসান দেখে একা হাঁটতে গা ছমছম করছে পারশনাথের। চোর-ডাকাত বেরিয়ে পড়লে পুলিশকে আগে মারবে। এত উর্দি-পেটি এঁটে বেরুনো ভাল হয়নি। মাথার টুপি, পরনের শার্ট, পায়ের জুতো, সব খুলে পুঁটলি করে নিল পারশনাথ। খালি পায়ে, খাকি প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে

হাঁটতে লাগল।

শেষ রাত্তিরে গ্রামের সীমান্তে এসে ধড়াচূড়া পরে নিল পারশনাথ। আসামির বাড়িতে হঠাৎ পুলিশ এসেছে, এই খবরটা সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। গরিব অশিক্ষিত গ্রাম, এখনো পিওনকে ধরে চিঠি পড়িয়ে নেয় বেশির ভাগ লোক ; পুলিশকে ভয়ের চোখে দেখে। এই গ্রামের সবচেয়ে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে সেই মৃত আসামির আত্মীয়স্বজন। তারা পুলিশ দেখলেই ভাবে ধরতে আসছে। একা কাছে যাবে না। পারশনাথের থেকে একটু দূরে জড় হয়েছে তারা, নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস করছে। আসামির ঘরের দাওয়ায় বসে পড়ে পারশনাথ পকেট থেকে নোটবই আর পেনসিল বের করে এমন ভাব করল যেন সব কিছু টুকে নিচ্ছে। সেই দেখে অল্প বয়সী একটা ছেলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। লিখতে লিখতে সিপাহিজি ওর দিকে তাকিয়ে গোঁফ নাচিয়েছিল। পারশনাথ এক ধমক দিল, "চওপ !" ছেলেটাকে বড়রা আড়াল করে দাঁড়াল। পারশনাথ যেন একটু বিরক্ত হয়েছে মনে হল, নোটবুক পকেটে রেখে গম্ভীর হয়ে হাঁকল, "আসামি মদনলাল জেলে মেয়াদ খাটছিল জানো ?"

সবাই মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

পারশনাথ প্রত্যেকের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, "উও মদনলালকা ওয়ারিশন কৌন আছে ?"

এগিয়ে এল পবনলাল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন সিপাইজি ? আমি মদনলালের ভাই।"

পবনলালকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল পারশনাথ। যেমন করে ওপরওলারা ওকে দেখে। পকেট থেকে বের করল খৈনির ডিব্বা। তামাক পাতা কুচি-কুচি করতে করতে বলল, "আপনা ! সওতালা ইয়া চচেরা ন চলব ববুয়া।" জমিয়ে তদন্ত করছে পারশনাথ। পবনলাল মদনলালের আপন ভাই, সৎ ভাই বা খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই নয়, সে ব্যাপারেও স্থির নিশ্চিত হল। এবার বলল, "তব্ মদনলালকা রুপয়া-পয়সা সভি তুহারি ভৈল।"

ঠিক বুঝতে পারল না পবনলাল। জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে দাদার ?"

মৃত্যু সংবাদ দিল পারশনাথ। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। পবনলাল খুব কাঁদছে। ভিড় করে যারা দেখতে এসেছিল তারা এগিয়ে এসে পবনলালকে ধরল। তাদের মধ্যে একজন প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারমশাই, পারশনাথের হিন্দি কথার মানে বোঝে, বলল, "এই পবন, ওঠ, সদরে যা। জেলে কাজকম্ম করলে দিন-মজুরি পায়, সে সবই মদন জমিয়ে রেখেছে, গিয়ে নিয়ে আয়। যে গেছে সে তো গেছেই, তার সৎকার করতে হবে তো। তা ছাড়া সরকারের কাছে আরো যদি কিছু পাওনাটাওনা থাকে— ।"

পারশনাথ বলল, "হাঁ থাকতে পারে। সব উহি পাবে।"

কেউ জানে না কিসের টাকা, কত টাকা, তবু গরিব গ্রামের সব চেয়ে গরিব পাড়ায় যেন লটারি পাওয়ার খবর এল। প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারমশাইকে একজন জিজ্ঞেস করল, "কত টাকা হতে পারে মাস্টার ?" মাস্টারমশাই একটু ভেবে বলল, "তা হাজার দু-হাজার হবে।" ভিড় পাতলা হয়ে গেল। পবনলালের অর্থভাগ্যের কথা পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে গেল, আর টাকার অঙ্কটাও লোকমুখে বাড়তে বাড়তে পঁচিশ-তিরিশ হাজারে উঠল।

তাই শুনে মাঠ থেকে কাদা পায়ে দৌড়ে এল আরো জনা-চারেক, তারাও মদনলালের টাকার দাবিদার। কেউ বলে, "ধার ছিল আমার কাছে," কেউ বলে, "আমি মামলার খরচ চালিয়েছি।" তার মধ্যে দুজন মদনলালের ভাই, আলাদা থাকত।

পবনলাল তাদের দেখে রুখে গেল, "টাকার গন্ধে অমনি ভাইয়ের শোক উথলে উঠল, না ? একদিন জেলখানায় দেখতে গেছ কেউ ?"

খানিক দূরে ভাইয়ের বউরা চুলোচুলি করছে। পারশনাথ উঠে দাঁড়িয়ে একটা হুঙ্কার দিল, "অ্যাই আস্তে ! কিচির-মিচির করব তো চালান কর দিব।"

পবনলাল বলল, "চলুন সিপাইজি, আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।" সঙ্গে সঙ্গে আর দাবিদাররা টেনে ধরল পবনলালকে। বলল, "তুমি একা যাবে মানে ! আমাদের ফাঁকি দিয়ে টাকা হজম করবে ? আমরা কি ভেসে এসেছি ?"

আবার সবাইকে থামাল পারশনাথ। বলল, "তুমলোগ সব্বাই তাহলে মদনলালের ওয়ারিশন ?"

ভাইয়েরা বলল, "হ্যাঁ।"

পাওনাদাররা বলল, "আমরা টাকা পাই।"

পারশনাথ জিজ্ঞেস করল, "উহার কিত্‌না সাল সাজা হয়েছিল জানো ?"

সবাই সমস্বরে বলল, "কেন জানব না ? পাঁচ বছর।"

পারশনাথের মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো বুদ্ধি খেলে গেল। বলল, "লেকিন দো সাল কয়েদ খেটে ফৌত হয়ে গেল।"

পবনলাল হিসেব করে বলল, "আসছে অঘ্রানে দু' বছর হত।"

পারেশনাথ গোঁফ মুচড়ে বলল, "হাকিম পড়ে তো হুকুম নড়ে না। ফির, কয়েদি নড়ে তো হুকুম নড়ে না।"

প্রাইমারি শিক্ষক বললেন, "সে আবার কী ?"

পারশনাথ বলল, "ওহি লিয়ে তো এত্‌না দূর আনা পড়ল। হুকুম হইয়েছে বাকি মেয়াদ ভি খাটতে হোবে। তিন সাল কৌন খাটবে তৈয়ার হো যাও।"

সব দাবিদাবের মুখ শুকিয়ে গেল।

পারশনাথ বলল, "আসামির, রুপয়া পয়সা লিবে, উহার বকেয়া মেয়াদ খাটবে না বাবুয়া ? কোই একজনকে তো লিয়েই যাব, হাঁ।"

অদূরে বউরা কান্না জুড়ে দিল। টাকা নিলেই জেল খাটতে হবে। পালা, পালা, সব। ওগো বলে দাও, মদনলাল আমাদের কেউ নয়, ও নামে কাউকে আমরা চিনি না।

সবাই পালাল, কিন্তু পবনলাল আর অন্যান্য দাবিদারদের আটকে রাখল পারশনাথ। হুমকি দিল, মদনলাল আগে ভাগে মরে গিয়ে সরকারকে ফাঁকি দিয়েছে। তার বাকি মেয়াদ তিন বছর এদের খাটতে হবে ভাগাভাগি করে। কে কদ্দিন খাটবে সেটা দারোগাবাবু ঠিক করবে। চলো থানা।

দাবিদাররা একত্রে বসে ঠিক করল, মদনলালের টাকা তারা চায় না। সিপাইজি দয়া করে একটা রিপোর্ট দিয়ে দিন এ গাঁয়ে মদনলালের কোনো ওয়ারিশন নেই।

পারশনাথ বলল, "ও হোবে না। সরকারি নৌকরি।"

ওরা নিজেদের মধ্যে তুলে তিরিশ টাকা দিল পারশনাথের হাতে। আর সেই টাকাসুদ্ধ হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, "সিপাইজি, আমাদের বাঁচান !"

থানায় ফিরে গেল পারশনাথ। বিপিন দারোগা তখন অফিসে বসে কাজ করছেন। মুখ না তুলেই বললেন, "আজকাল বাকি মেয়াদে খাটার যে আইন হয়েছে তা খাটতে হবে তাকে যে লোক ঠকিয়ে খায়।"

চমকে উঠল পারশনাথ। পাদুটো আবার কাঁপছে। সজোরে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে বলল, "হুজৌর !" দারোগা একবার মুখ তুলে দেখলেন। লোকটা কি মন্তর জানে ? আর কিছু বলার আগেই বললেন, "দেখি, টাকাটা বার করো। পাঁচ টাকার ছ-খানা নোট। যাদের টাকা তাদের পাঠিয়ে দিতে হবে।

ছবি অনুপ রায়

অভিনন্দন !

ক্যাডবেরিস্

'জেমছবি'

প্রতিযোগিতার বিজেতাদের, আন্তরিক অভিনন্দন !

আর যারা এতে অংশগ্রহণ করেছেন,
তাঁদের সবাইকেও জানাই অশেষ ধন্যবাদ !

এই হল তার ফলাফল :

প্রথম পুরস্কার

কুমারী লীনা সাকপাল
শীতল বাগ, ৬৪ ডি. ওয়ালকেশ্বর রোড. বোম্বাই-৪০০ ০০৬
জিতেছেন একটি বি এস এ এস এল আর সাইকেল,
৩ স্পীড গিয়ার ও আনুষঙ্গিক সুবিধা সমেত।

দুটি দ্বিতীয় পুরস্কার

কুমারী শুভ্রা সাহা
এন ৬, রেলওয়ে অফিসার্স' কলোনী, জে. কে. পাল রোড,
নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০ ০৩৮

কুমারী অপর্ণা আর
৪/১০৫. দ্বিবাদেবীর পেছনে, এন. আর মোহাল্লা, মহীশূর-৫৭০ ০০১
জিতেছেন দ্বিতীয় পুরস্কার একটি করে এইচ এম টি কোয়ার্টজ ঘড়ি।

তিনটি তৃতীয় পুরস্কার

কুমারী ঐশ্বর্য্য দাস
কোচিন রিফাইনারিজ স্কুল, পোঃ আম্বালামুগল
পিন কোড ৬৮২ ৩০২, কেরালা

কুমারী গৌরী বৈদ্য
৪০৮/৩. গোখলে রোড. পুণা-৪১১ ০১৬

কুমারী কল্যাণী সরকার
মেসার্স' বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড কোং লিঃ, পোঃ দূর্গাপুর ৭১৩ ২০১
জিতেছেন তৃতীয় পুরস্কার ৩০০ টাকা দামের বই প্রত্যেকে

৪০০ সান্ত্বনা পুরস্কার
বিজেতাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ডাক মারফৎ জানানো হবে।

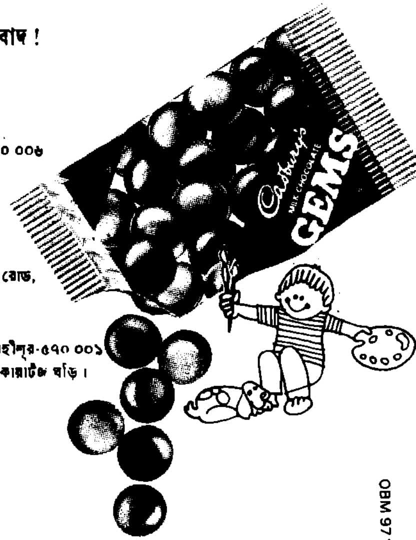

OBM 9716 BN

ক্যাডবেরিস্
চকোলেটস

ক্যাডবেরি জেমস্ এমন, মিষ্টিমধুর স্বপ্ন যেমন!

ধীরাজের লাঞ্চ খাওয়া

মঞ্জিল সেন

চাকরির চিঠিটা পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল ধীরাজ। জীবনের প্রথম চাকরি, তার অনুভূতিই আলাদা। মাইনে অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই, ওপরে উঠতে হলে প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই শুরু করতে হয়।

কার্শিয়াংয়ের কাছে একটা ল্যাবরেটরিতে কেমিস্টের চাকরি। বিলেত-ফেরত একজন বাঙালি ওই ল্যাবরেটরির প্রতিষ্ঠাতা, ওষুধ-পত্তর নিয়ে গবেষণা হয় ওখানে। মনে অনেক আশা আর উৎসাহ নিয়ে দার্জিলিং মেলে চেপে বসল ধীরাজ।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে বাসে করে গেলে কয়েক ঘন্টা আগে পৌঁছনো যাবে। সেদিন অবশ্য ট্রেন লেট ছিল তাই নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছতেই একটু দেরি হয়ে গেল। বাসে করে কার্শিয়াং পৌঁছতে-পৌঁছতেই সাড়ে বারোটা, ওখান থেকে কর্মস্থল মিনিট-পনেরোর পথ। নিয়োগপত্রের সঙ্গে আলাদা একটা চিঠিতে ওকে জানানো হয়েছিল, প্রথমদিন দুপুরে খাবার ব্যবস্থা থাকবে। ল্যাবরেটরির দরোয়ান ওকে জানাল যে, ও যেন আর দেরি না করে বড় সাহেবের বাংলোয় চলে যায়। সেখানেই লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলোটা অবশ্য কাছেই। ধীরাজের পেট খিদেয় চোঁ-চোঁ করছিল, লাঞ্চের নামে জিভে জল এসে গেল। বিলেত-ফেরত বাঙালিসাহেবের বাংলোয় খাওয়াটা ভালই হবে নিশ্চয়।

ও তাড়াতাড়ি হাতে-মুখে জল দিয়ে জামা-কাপড় বদলে নিল। খোদ মালিক ওর জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁকে বসিয়ে রাখা উচিত হবে না।

ও যখন বেরুবে ঠিক তখন একজন

অবাঙালি এসে যেচে ওর সঙ্গে আলাপ করল। নাম বলল সাভাং, বছর কয়েক ওখানে কাজ করছে। বয়স তিরিশের কোঠায়, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ চেহারা। ধীরাজকে সে স্বাগত জানাল, তারপর চোখ মটকে বলল, "বড় সাহেবের ওখানে লাঞ্চ খেতে যাচ্ছ বুঝি?"

ধীরাজ ঘাড় দোলাল। লোকটার ভাব-ভঙ্গি ভাল লাগল না ওর, বড় সাহেব খেতে বলেছেন তাই হিংসে করছে নাকি ওকে!

"নতুন কেউ এলেই বড় সাহেব প্রথম দিন লাঞ্চ খাওয়ান। তাড়াতাড়ি যান, উনি আপনার জন্য বসে আছেন," একটু যেন রহস্য করে হাসল সাভাং। হাসিটা ভাল ঠেকল না ধীরাজের।

নেপালি দরোয়ানই ধীরাজকে বাংলোর পথটা বাতলে দিল, বেশি দূরে নয়। তবে চড়াই আর উতরাই পেরিয়ে ওর খিদেটা যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

বড় সাহেবের নাম এস, কে, ভোঁস্ (বোসের ইংরেজি রূপান্তর)। স্লিপ দিতেই বেয়ারা ধীরাজকে একেবারে খাবার ঘরে নিয়ে গেল। ডাইনিং টেবিলের চারপাশে দু-জন ভদ্রলোক আর দু-জন ভদ্রমহিলা, যেন ওর জন্যই অপেক্ষা করছেন। বয়সে যিনি প্রবীণ তিনিই মিঃ ভোঁস্। রঙ একটু ময়লা হলেও সুশ্রী চেহারা, দু-পাশের রগে পাক ধরেছে। পরনে শার্ট, প্যান্ট, ভেস্ট আর টাই। তিনিই অন্যদের সঙ্গে ধীরাজের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বয়স্কা মহিলা হলেন মিসেস ভোঁস, আর অল্প বয়সী ভদ্রলোক তাঁদের জামাই। চতুর্থজন অবশ্যই তাঁদের মেয়ে। ছোট করে চুল ছাঁটা, ঠোঁটে-মুখে রঙের প্রলেপটা একটু বেশিই।

মিঃ ভোঁস্ আর মিসেস ভোঁস্ টেবিলের দু-প্রান্তে বসেছেন। মেয়ে-জামাই বসেছে দু-পাশে, মুখোমুখি। ধীরাজের আসন জামাইয়ের পাশে। ধীরাজ লক্ষ করে দেখল, জামাইয়ের চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট, যেন একজন কর্মচারীর সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসাটা মনঃপূত নয়।

উর্দিপরা বাবুর্চি খাবার সার্ভ করছে। সবার সামনে বড়-বড় চিনেমাটির রেকাবি, পাশে ছোট-ছোট রেকাবি।

প্রথমে স্যুপ। বিলিতি রান্নার আয়োজন, মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ধীরাজ। খিদেটা আবার চাড়া উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ছোট রেকাবির একটাতে বড় হাতার এক হাতা গরম স্যুপ দিয়ে গেল বাবুর্চি। একটু দমল ধীরাজ, মাত্র এক হাতা করে স্যুপ! পেটের একটা কোনাও তো ভরবে না। ও আবার একটু খাইয়ে মানুষ, পেটুক বলে বন্ধুমহলে দুর্নাম আছে। ওই বাটির মতো রেকাবিতেই একটা করে চামচ ছিল। তাই দিয়ে সবাই স্যুপ খাওয়া শুরু করে দিয়েছে।

ধীরাজও এক চামচ মুখে তুলল, সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল বমি করে ফেলবে। একেবারে যেন সাবানগোলা জল, বিস্বাদ। আড়চোখে ও তাকিয়ে দেখল ওটাই বেশ তৃপ্তি করে সবাই সপ্-সপ্ করে খাচ্ছে। ওর অবস্থা যেন ত্রিশঙ্কু—না পারে ফেলতে, না পারে গিলতে। কোনোমতে ওটাই শেষ করতে হল ওকে।

একটা রেকাবিতে ভাত নিয়ে এল বাবুর্চি, জুঁইফুলের মতো ধব্-ধব্ করছে সরু চালের ভাত, ভুর-ভুর্ গন্ধ বেরুচ্ছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল ধীরাজ। ভাত না হলে বাঙালির চলে!

একটা বড় চামচ দিয়ে বাবুর্চি ভাত ঢালছে। প্রথমে ভোঁস্ সাহেবের রেকাবিতে। গুনে গুনে আড়াই চামচ। ধীরাজ ভাবল ভোঁস্ সাহেব হয়তো ডায়েটিং করছেন, কিংবা হয়ত ভাত খাবার ব্যাপারে ডাক্তারের নিষেধ আছে। কিন্তু বাবুর্চি যখন অন্যদের পাতেও ওই একই পরিমাপের ভাত ঢালল তখন ওর চক্ষুস্থির। সর্বনাশ! বাবুর্চি রেকাবিতে যতটা ভাত এনেছিল তার সবটাই যদি ওর পাতে ঢেলে দেয় তবু ওর

পেট ভরবে না, অমন দু-রেকাবি অনায়াসে ও উড়িয়ে দিতে পারে।

বাবুর্চি ডাল নিয়ে এল। সবার পাতে বড় চামচের এক চামচ করে দিয়ে গেল। খিদের মুখে খাবারের অনুপাতের ওই নমুনা দেখে ধীরাজের কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। বাইরে বেরিয়ে যে খাবে তারও উপায় নেই, আসার সময় পথে হোটেল কেন, একটা দোকানও চোখে পড়েনি ওর। এ দিকটায় বসতি কম, একটু নির্জন, দোকানপাটও নেই বোধহয়।

ওই আড়াই চামচ ভাতের আদ্ধেকটা দিয়ে ভোঁসসাহেবের পরিবারের সবাই ডাল খেলেন, পরের আইটেমের জন্য রেখে দিলেন বাকিটা। ধীরাজ কিন্তু ডাল দিয়ে পুরো ভাতটাই মেখে নিল। বাবুর্চি দয়া করে ওর পাতে আরও দু-চামচ ভাত দিল।

পরের আইটেম মাংস। দ্বিতীয় ছোট্ট রেকাবিতে বাবুর্চি মেপে মেপে ঢালল বড় চামচের দু-চামচ টকটকে লাল ঝোল, একটা আলু আর এক টুকরো মাংস। ঝোলটা দেখেই আঁতকে উঠল ধীরাজ। গুচ্ছের শুকনো লঙ্কা বেটে দিয়েছে, দেখেই বোঝা যায়। সত্যিই তাই। ভীষণ ঝাল। দু-চামচ ভাতের সঙ্গে ওই ঝোল মেখে খেতে খেতে চোখ আর নাক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ধীরাজের। মাংসের টুকরোটা একটা শক্ত হাড়।

সবশেষে ছোট একটা কাচের বাটিতে কাস্টার্ড, তার মধ্যে কলার টুকরোই বেশি। তাও ওটাই একটু পদের।

খাওয়া শেষ হল। ধীরাজের পেট তো ভরল না বরং খিদেটা যেন বেড়ে গেল চতুর্গুণ। একটা শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও।

বাংলোর বাইরে একটা গাছের তলায় সাভাংকে বসে থাকতে দেখে ধীরাজ তো অবাক। ও এখানে কী করছে! একটু এগিয়ে ও দেখল ঘাসের ওপর একটা পুরনো খবরের কাগজ বিছিয়ে সাভাং একটা এক পাউণ্ডের পাউরুটি ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে কাটছে আর জেলি মাখাচ্ছে। কিন্তু সাভাং এখানে রুটিতে জেলি মাখাচ্ছে কেন?

ধীরাজ কাছে দাঁড়াতেই সাভাং মুখ তুলে তাকাল, তারপর হাসি-হাসি মুখে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "খাওয়া হল?"

ধীরাজ ঘাড় কাত করল।

"খুব খেয়েছ? স্যুপ, ডালের জুস,

মাংসের কারি, কাস্টার্ড—তাই না ?" হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে সাভাংয়ের সারা মুখে।

ধীরাজ একটু থমকাল। মেনুটা সাভাং জানাল কেমন করে ?

"পেট ভরে খেয়েছ তো ?" আবার প্রশ্ন করল সাভাং।

"হ্যাঁ," আমতা-আমতা করে জবাব দিল ধীরাজ।

এবার আর থাকতে পারল না সাভাং, হো-হো করে হেসে উঠল, হাসির দমকে ওর দু-চোখের কোল বেয়ে নামল জলের ধারা। হাসি থামিয়ে ও বলল,"আড়াই চামচ ভাত, এক চামচ ডাল আর এক টুকরো মাংস, কেমন ? বহুত খানা খেয়েছ।"

আবার অট্টহাসি করে উঠল সাভাং, হাসি যেন থামতেই চায় না। তারপর বলল, "নাও, আর দেরি কোরো না, বসে যাও। এখানে কাছাকাছি দোকান-পাট নেই, ঘরে রুটি আর জেলি ছিল তাই নিয়ে এসেছি. পেটটা অন্তত ভরবে।

ধীরাজের বিস্ময়ের যেন আর শেষ নেই। "তুমি কী করে জানলে ?" ও জিজ্ঞেস করল।

"আরে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন আমাকেও প্রথমদিন বড়সাহেব লাঞ্চের নেমন্তন্ন করেছিলেন," সাভাং রহস্যটা ফাঁস করল, "জোয়ান বয়সে চামচের মাপা খাবারে কি পেট ভরে ? আমিও সেদিন তোমার মতো পেট চেপে বেরিয়ে এসেছিলাম। তাই আজ রুটি আর জেলি নিয়ে এসেছি, তুমি এখানে নতুন এসেছ, খিদের মুখে কষ্ট পাবে ভেবেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

দ্বিতীয়বার অনুরোধের অপেক্ষা আর করল না ধীরাজ, ধপ্ করে মাটিতে বসে জেলি মাখানো রুটি পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবুতে শুরু করে দিল, আর ঠকতে ও রাজি নয়।

ছবি : দেবাশিস্ দেব

আপ-টু-ডেট

আর একটা নতুন বছর এলো তোমাদের জীবনে। সবাই এখন নতুন নতুন বইখাতার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছ। সামনে একটা বছর কত কিছু নতুন জিনিষ পড়বে, শিখবে।

শেখা আর জানার কিন্তু শেষ নেই জীবনে। রোজকার পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও কত কিছু অজানা, অচেনা ছড়িয়ে রয়েছে। চোখ, কান খুলে রেখে ঐসব বাইরের তথ্যগুলোও জোগাড় করে নিতে হবে সবাইকে। আজকের দিনে "জেনারেল নলেজ" যার যত বেশী সে তত জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর এ যুগটাই হ'লো নিত্য নতুন আবিষ্কারের যুগ। এখন কি শুধু পড়ার বই মুখে নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে ? নানান বিষয়ের ওপর কত কত বই, রেডিও, টি ভি এই সমস্ত জগৎটাকে তোমাদের খুব কাছে এনে দিয়েছে তো ? মনে রাখবে সব সময় সব খবরে 'আপ-টু-ডেট' থাকতে হবে। তাই বলে ক্লাসের পড়ায় যেন পিছিয়ে না পড়ি।

আর সেই সঙ্গে নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং স্বাস্থ্যবিধি অভ্যেস করতে হবে। নিজেদের পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখা, ভালভাবে দাঁত মাজা, বাইরে থেকে ফিরে হাত পা ধুয়ে ঘরে ঢোকা সব কাজেই 'ডিসিপ্লিন' থাকা জরুরী।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস কলিকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত।

মাথা

বিমল দত্ত

মাথা নাই, মাথাব্যথা—কী-রকম বাক্য,
মাথায় দিয়েছি হাত, মাথাজোড়া টাক তো !
মাথা দেওয়া সব কাজে, নহে মোর কার্য ;
মাথা দেখে জানা যায় আর্য অনার্য।
গ্রামের যে মাথা তার বয়স একশোআশি
তিন মাথা এক হল, গিয়েছে তীর্থে—কাশী।
তার ছেলে, মাথা আছে, নাম তার এককড়ি
খাটিয়ে সে মাথা এক বানিয়েছে ট্যাঁকঘড়ি।
মাথা খাও কোরো নাকো এমন কাজটি আর
মাথা হেঁট হবে মোর বলে রাখি বারবার।
রাগের মাথায় কাজ করা ঠিক নয়, জেনো
মাথাপিছু পাঁচ টাকা মজুরিতে লোক এনো।
হাতে যে-বা মাথা কাটে মাথায় চড়িয়ে তায়
ধেই ধেই নেচো নাকো, বলে রাখি কবিতায়।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

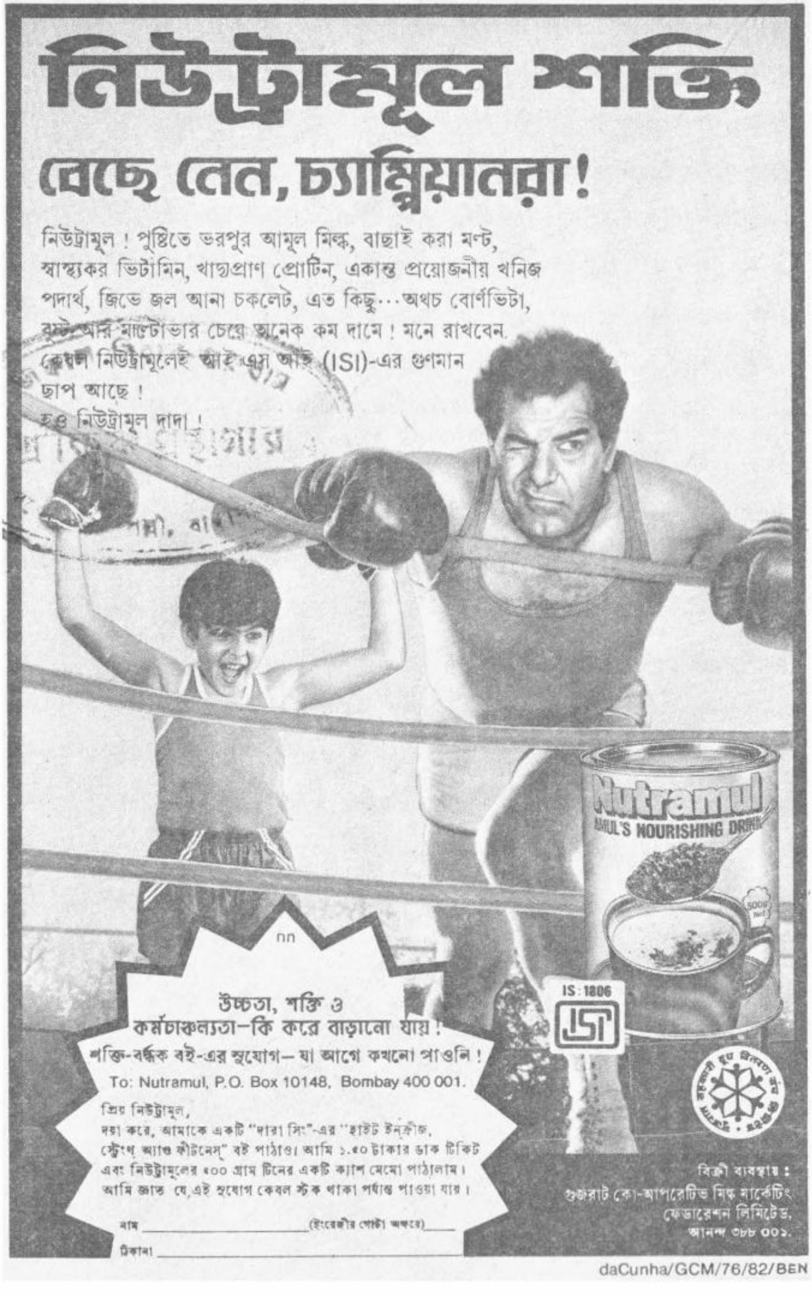

নিউট্রামূল শক্তি
বেছে নেন, চ্যাম্পিয়ানরা!
নিউট্রামূল ! পুষ্টিতে ভরপুর আমূল মিল্ক, বাছাই করা মল্ট, স্বাস্থ্যকর ভিটামিন, খাদ্যপ্রাণ প্রোটিন, একান্ত প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ, জিভে জল আনা চকলেট, এত কিছু···অথচ বোর্ণভিটা, বুস্ট আর মাল্টোভার চেয়ে অনেক কম দামে ! মনে রাখবেন, কেবল নিউট্রামূলেই আই এস আই (ISI)-এর গুণমান ছাপ আছে !
হও নিউট্রামূল দাদা !
Nutramul
AMUL'S NOURISHING DRINK
IS : 1806
ISI
উচ্চতা, শক্তি ও
কর্মচাঞ্চল্যতা—কি করে বাড়ানো যায় !
শক্তি-বর্দ্ধক বই-এর সুযোগ— যা আগে কখনো পাওনি !
To: Nutramul, P.O. Box 10148, Bombay 400 001.
প্রিয় নিউট্রামুল,
দয়া করে, আমাকে একটি "দারা সিং"-এর "হাইট ইনক্রীজ, স্ট্রেংথ অ্যাণ্ড ফীটনেস্" বই পাঠাও। আমি ১.৫০ টাকার ডাক টিকিট এবং নিউট্রামুলের ৫০০ গ্রাম টিনের একটি ক্যাশ মেমো পাঠালাম। আমি জ্ঞাত যে,এই সুযোগ কেবল স্টক থাকা পর্যান্ত পাওয়া যায়।
নাম ________ (ইংরেজীর গোটা অক্ষরে) ____
ঠিকানা ________
বিক্রী ব্যবস্থায় :
গুজরাট কো-আপরেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড,
আনন্দ ৩৮৮ ০০১.
daCunha/GCM/76/82/BEN

জঙ্গলগড়ের চাবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সকালবেলা পার্কে কারা যেন কাকাবাবুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। কাকাবাবু প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীরে পক্ষাঘাতের মতন হয়ে গেল। স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হল ত্রিপুরায়। সেখানে নানা রকম উপদ্রব হতে লাগল। তারপর এক রাতে একদল মুখোশধারী এসে সন্তু আর কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গেল জোর করে। একটা নির্জন বাড়িতে ওদের বন্দী করে রাজকুমার নামে একজন লোক কাকাবাবুর ওপর অত্যাচার করতে লাগল, তাঁর কাছ থেকে জঙ্গলগড়ের খবর জানবার জন্য। এমন সময় কাকাবাবুর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মা পুলিশ নিয়ে এসে পড়ায় পালিয়ে গেল ওরা। সঙ্গে নিয়ে গেল সন্তুকে। এবারে অনেক দূরে একটা টিলার ওপরে পাথরের বাড়িতে বন্দী হয়ে রইল সন্তু। পরদিন সকালে...

॥ ২২ ॥

সামনে একটা টানা বারান্দা। কোথাও কেউ নেই। তবে কিসের একটা শব্দ যেন পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল মেঘের গর্জন। কিন্তু একটু আগেই সন্তু জানলা দিয়ে দেখেছে যে আকাশ একেবারে নীল, কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। তারপর মনে হল, কেউ যেন পাথরের ওপর আর একটা পাথর ঘষছে। আরও একটু মন দিয়ে শোনবার পর সন্তু বুঝতে পারল, আসলে ওটা কারুর নাক ডাকার আওয়াজ।

আওয়াজটা পাশের একটা ঘর থেকে আসছে। সন্তু পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল। সে-ঘরের দরজা বন্ধ। সন্তু হাত দিয়ে একটু ঠেলল, তবু সেটা খুলল না।

সন্তু আর একটু এগিয়ে গিয়ে আর একটা ঘর দেখতে পেল। এ-ঘরের দরজা খোলা। কোনো বিছানা-টিছানা নেই, খালি মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে 'কর্নেল' আর দু'জন লোক। কর্নেল-এর মাথার কাছে রয়েছে রিভলভার। বোধহয় ওদের পাহারা দেবার কথা ছিল।

সন্তুর একবার লোভ হল চুপি চুপি গিয়ে টপ করে রিভলভারটা তুলে নেয়। তারপর নিজেকে সামলে নিল। যদি হঠাৎ জেগে ওঠে ওরা কেউ, তা হলে মুশকিল আছে, কর্নেল লোকটা বড্ড নিষ্ঠুর ধরনের।

সন্তু এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। তার বুকের ভেতরটা ছমছম্ করছে। তাকে যে কেউ বাধা দিচ্ছে না, এটাতেই ভয় লাগছে বেশি। খালি মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ যেন তাকে লক্ষ করছে, হঠাৎ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একতলাতেও কারুকে দেখা গেল না। সেই 'মেজর'-ই বা গেল কোথায়? একতলায় সব কটা ঘর তালাবন্ধ। অনেক দিন সেই সব তালা খোলা হয়নি মনে হয়। মাঝখানে একটা উঠোন। তার এক পাশে একটা ছোট দরজা, সেটা দিয়ে বোধহয় বাড়ির পেছনটায় যাওয়া যায়।

সন্তু সেই দরজার কাছে এসে উঁকি মারল। কাছেই একটা কুয়ো। বেশ উঁচু করে পাড় বাঁধানো। দুটো খরগোশ সেখানে ঘুরঘুর করছে। সন্তু কোনো শব্দ করেনি, শুধু তার ছায়া পড়তেই ওরা টের পেয়ে গেল। দু'এক পলক কান খাড়া করে খরগোশ দুটো দেখল সন্তুকে। তারপরই পেছন দিকটা উঁচু করে মারল লাফ। প্রায় চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

সন্তু কুয়োটার কাছে এসে এদিক-ওদিক তাকাল। খরগোশ দুটোর গায়ের রং পুরো সাদা নয়, খয়েরি-খয়েরি, তার মানে ওরা

বুনো খরগোশ। একটু দূরে একটা করমচা গাছের নীচে আর একটা খরগোশ বসে আছে। এবারেও এর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দৌড় মারল। বেশ মজা লাগল সন্তুর। এখানে তো অনেক খরগোশ। সেইজন্যই কাল রাত্রে 'মেজর' লোভ দেখাচ্ছিল খরগোশের মাংস খাওয়াবার।

বাড়ির পেছন দিকটায় এক সময় নিশ্চয়ই বেশ বড় বাগান ছিল। এখন ফুলগাছ-টাছ বিশেষ নেই, আগাছাই বেশি। বাউণ্ডারি দেওয়ালের পাশে পাশে রয়েছে অনেকগুলো কাঁঠাল গাছ। তাতে কত যে কাঁঠাল ফলে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। অনেকগুলো পাকা কাঁঠাল মাটিতেও পড়ে আছে, কেউ খায় না বোধহয়। সন্তুও কাঁঠাল খেতে ভালবাসে না। কিন্তু এঁচোড়ের তরকারি তার ভাল লাগে। এত কাঁঠালে কত এঁচোড়ের তরকারিই না হতে পারে!

শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সন্তু যেন হঠাৎ ডাকাত-ফাকাত, গুপ্তধন, মারামারির কথা সব ভুলে গেল। মাথার ওপর নীল আকাশ, ঝকঝকে রোদ উঠেছে, বাতাসও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, সন্তুর মনে হল সে যেন কোথাও বেড়াতে এসেছে। টিলার ওপর এই রকম একটা বাড়ি, কাছাকাছি মানুষজন নেই, এইরকম জায়গা বেড়াবার পক্ষে খুব চমৎকার। মা-বাবা আর সবাই মিলে এলে কী ভাল হত!

হাঁটতে হাঁটতে সন্তু বাড়িটার সামনের দিকে চলে এল। গেটের কাছে তিনটে ঘোড়া এখনো বাঁধা আছে। ঘোড়াগুলোকে দেখে সন্তুর কালকের রাতের কথা মনে পড়ল। বাব্বাঃ, এক রাতের মধ্যে কত কী কাণ্ডই না ঘটেছে! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এই ডাকাতরা সন্তুকে ধরে আনলেও সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই যে, কাকাবাবুর আর অসুখ নেই, তিনি ভাল আছেন।

কাকাবাবু কি তার চিঠিটা পেয়ে গেছেন এতক্ষণে?

সন্তু একবার মুখ ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল। কই, কেউ তো জাগেনি। কেউ তো তার ওপর নজর রাখছে না। সন্তু এখন স্রেফ একটা দৌড় মেরে পালিয়ে গেলে কে তাকে ধরবে?

ঘোড়াগুলোর কাছে এসে সন্তু দাঁড়াল। এগুলো বেশি বড় ঘোড়া নয়, পাহাড়ি টাট্টু ঘোড়া। এই একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে পালালে কেমন হয়?

সন্তু কখনো ঘোড়ায় চড়া শেখেনি। তবু তার ধারণা হল, টাট্টুঘোড়ার পিঠে চাপা সহজ। যে-কেউ পারে। একটা ঘোড়ার পিঠে হাত রাখল সন্তু, ঘোড়াটা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল, সন্তুকে লাথি-টাথি কিছু মারার চেষ্টা করল না।

ঘোড়ায় চাপার ইচ্ছেটা সন্তুর একেবারে অদম্য হয়ে উঠল। একটা ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিয়ে লাগামটা হাতে নিল সে। পিঠে কিন্তু জিন নেই। লাফিয়ে কী করে পিঠে উঠবে, ভাবতে ভাবতে সন্তুর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। লোহার গেট বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে তারপর ঘোড়ার পিঠে চাপা যেতে পারে।

সেইভাবে ঘোড়াটায় উঠে সন্তু বলল, হ্যাট হ্যাট!

কিন্তু ঘোড়াটা নট নড়ন-চড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সন্তু তার হাঁটু দিয়ে কয়েকটা গোঁত্তা দিলেও কোনো লাভ হল না।

কিন্তু একবার ঘোড়ায় চেপে পালাবার প্ল্যান করে আবার সেটা বদলাবার কোনো মানে হয় না। এখন যদি কেউ এসে পড়ে তা হলে সন্তুকে দেখে নিশ্চয়ই হাসবে। ঘোড়ায় চড়া বীরপুরুষ, অথচ ঘোড়া ছোটাতে জানে না।

মরিয়া হয়ে সন্তু হাঁটু দিয়ে গোঁত্তাও মারতে লাগল, আর লাগামটা ধরেও টানতে লাগল খুব জোরে।

তাতে ঘোড়াটা চিঁ-হি-হি-হি আওয়াজ করে শূন্যে দু'পা উঁচু করল একবার। তারপর ছুটতে লাগল।

প্রথম ঝাঁকুনিতে সন্তু প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু বল্‌গাটা খসে গেল তার হাত থেকে। মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে সে বল্‌গাটা আর ধরতে পারল না কিছুতেই।

ঘোড়াটা যখন বেশ জোরে টিলার নীচের দিকে নামতে লাগল, তখন সন্তুর মনে হল, সে আর কিছুতেই ব্যালান্স রাখতে পারবে না। এই অবস্থায় ছিটকে পড়ে গেলে হাত-পা ভাঙবে নিশ্চয়ই। আর কোনো উপায় না দেখে সন্তু ঘোড়াটার গলাটা জড়িয়ে ধরল প্রাণপণে।

ঘোড়াটাও বেশ অবাক হয়েছে নিশ্চয়ই। কারণ সে মাঝে-মাঝেই চিঁ-হি-হি-হি করে ডাক ছাড়ছে। সে ছুটছেও এলোমেলোভাবে। টিলাটার নীচেই জঙ্গল, সেখানে ঢুকে ঘোড়াটা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে বড় বড় গাছের ধার ঘেঁষে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সন্তুর গা ঘষটে যাচ্ছে। এক একবার সে ভাবছে কোনো গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়বে কি না। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

কোন্ দিকে যে ঘোড়াটা যাচ্ছে তাই বা কে জানে! জঙ্গল ক্রমেই ঘন হচ্ছে। কাল রাত্তিরে এই পথ দিয়েই গিয়েছিল কি না তা সন্তুর মনে নেই। অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে কিছু দেখতেই তো পায়নি সে।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে ঘোড়াটা একটা নদীর সামনে থামল। কাল রাতেও সন্তুরা একটা নদী পার হয়েছিল। এটা কি সেই নদী? তাই বা কে জানে!

যা থাকে কপালে, ভেবে সন্তু লাফিয়ে নেমে পড়ল নদীর ধারের নরম মাটিতে। আসলে ঐভাবে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ও-রকমভাবে আর যাওয়া যাবে না।

যাই হোক, সন্তু মোটামুটি তার সার্থকতায় বেশ খুশি হয়েছে। বিনা বাধাতেই সে পালিয়ে আসতে পেরেছে। এখন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তার কোনো আপত্তি নেই। ঘুরতে ঘুরতে ঠিক কোনো এক সময় সে একটা কোনো শহরে

পৌঁছে যাবে।

এতক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে সন্তু কোনো মানুষজন দেখেনি। এবারে নদীর ধারে সে যেন কাদের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেল।

একটা কী যেন বড় গাছ নদীর ওপরে অনেকখানি ঝুঁকে আছে। কথা শোনা যাচ্ছে তার ওধার থেকেই। সন্তু আস্তে আস্তে গিয়ে গাছটার কাছে দাঁড়াল। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখল দুজন জেলে মাছ ধরছে। একজন বয়স্ক লোক, একজন প্রায় সন্তুর সমান।

সন্তু ভাবল, যাক, ভয়ের কিছু নেই। তবে তক্ষুনি সে লোকগুলোর কাছে গেল না। এদিকেই একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। ওদের কথাবার্তা সে শুনতে পাচ্ছে। একটু পরেই ওদের কয়েকটা কথা শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বয়স্ক জেলেটি ছোট ছেলেটিকে বলছে, "সবই কপাল, বুঝলি ? আমিও মাছ ধরি আর তোর সুবলকাকুও মাছ ধরত। সেই ছোটবেলা থেকে আমরা সমানে এই কাজ করেছি। মাছ ধরা ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না। অথচ, আজ আমি কোথায় আর তোর সুবলকাকু কোথায় !"

ছেলেটি বলল, "সুবলকাকুকে তো সাপে কামড়েছে !"

ছেলেটি বলল, "সাপে কি আর এমনি এমনি কামড়েছে। নিয়তি যে ওরে টেনে নিয়ে গেছে। আমি বারণ করেছিলুম।"

ছেলেটি বলল, "মাছ ধরা ছেড়ে সুবলকাকু জঙ্গলে খরগোশ মারতে গিয়েছিল।"

"খরগোশ না হাতি ! আমরা জলের মাছ মারতে জানি. ডাঙার শিকারের কী জানি ! আসল কথা কী জানিস, একদিন হাট থেকে সুবল আর আমি ঐ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরতেছিলাম, এমন সময় কী যেন একটা জিনিস চকচক করে উঠল। একটুখানি মাটি খুঁড়ে সুবলই সেটা টেনে তুলল। সেটা একটা সোনার টাকা। আগেকার রাজামহারাজাদের আমলে ঐ রকম টাকার চল ছিল। তা সেই টাকাটা পেয়ে সুবলের কী আহ্লাদ ! লাফাতে লাগল একেবারে। আমি বললুম, ওরে সুবল, এসব বড় মানুষদের জিনিস, গরিবের ঘরে রাখতে নেই। ও টাকাটা তুই থানায় জমা দিয়ে দে। সে কথা সে কিছুতেই শুনবে না। সোনার টাকা পেয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেল। অন্য কাজকম্ম সব ছেড়েছুড়ে দিন-রাত জঙ্গলে পড়ে থাকত। লোককে বলত খরগোশ মারতে যায়, কিন্তু আমি তো জানি ! ও সেখেনে যত গর্ত আছে আর পাথরের ফোকর আছে, সব জায়গায় হাত ভরে ভরে খুঁজত। সেইরকম একটা গর্তে হাত ঢুকিয়েই তো সাপের কামড় খেলে !"

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "জঙ্গলের মধ্যে একখানা সোনার টাকা এল কী করে ?"

বয়স্ক লোকটি বলল, "ও জায়গাটারে কয় জঙ্গলগড়। এককালে ওখানে ত্রিপুরার এক মহারাজা এসে লুকিয়ে ছিলেন। তাই লোকে এখনো বলে, ওখানকার মাটির নীচে অনেক সোনাদানা পোঁতা আছে।"

জঙ্গলগড়ের নাম শুনেই সন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে। এই বয়স্ক লোকটি তা হলে জানে জঙ্গলগড় কোথায় ? তা হলে তো এক্ষুনি ওর সঙ্গে ভাব করা দরকার।

কিন্তু সন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাবার আগেই অন্য একটা শব্দ শুনতে পেল। টগবগ টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে কারা যেন এদিকেই আসছে। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

৫৯

সক্রেটিস মৃত্যুর আগে তাঁর এক শিষ্যকে বললেন, অমুকের কাছ থেকে একটা মোরগ ধার করেছিলাম, মনে করে ঋণটা শোধ করে দিও।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
প্যাকো ডিয়াজ রোভার্সে আসায় মার্ভিন ওয়ালেস ক্ষুব্ধ। রাসবুর্গের সঙ্গে খেলায় মার্ভিনের বদলে ট্রেভর নেমেছে। রাসবুর্গ এক গোলে এগিয়ে আছে।
যাঃ!
ধুত, ট্রেভরকে আবার কাটাল ফিশার!
মার্ভিন থাকলে কাটাতে পারত না!
উঃ! আর একটু হলেই রয় ও-বল নিজের গোলে ঢোকাত!
বাঁচিয়েছি!
কর্নার!
উপায় ছিল না চার্লি!
ঠিক করেছ রয়!
কর্নার থেকে বল পেয়ে হেড করেছে ফিশার—
শাবাশ চার্লি!
মার্ভিনকে নামাও!
মার্ভিন ছাড়া ফিশারকে আটকানো যাবে না!
রয় সে-কথা বুঝছে না কেন?
রয় কেন মার্ভিন ওয়ালেসকে নামাচ্ছে না?
ফিশার আজ দুর্দান্ত খেলছে। দেখা যাক—
বিরতির সময়—
বাপ্স, ফিশার আমাদের দম বার করে দিচ্ছে!
সত্যি নোয়েল, রয়ের কিছু করা উচিত!

ফিশার এমন-কিছু উঁচু দরের খেলোয়াড় নয় !
বটে ?
আরে, আমি হলে ফিশারকে কাটিয়ে দমাদ্দম গোল করতুম !
রয়, তুমি প্যাকোকে একটু চুপ করতে বলবে ?
কেন, প্যাকো তো ভুল বলেনি !
রয় এত প্যাকোর সপক্ষে কথা বলে কেন ?
মার্ভিন এতে আরও রেগে যাচ্ছে !
বদলি হিসেবেও ওকে নামানো যাবে না !
রাসবুর্গ আবার চেপে ধরেছে !
ফিশারকে আটকানো দরকার !
ট্রেভরকে আবার বোকা বানিয়েছে !
নাও !
দারুণ পাস !
জেরি ঢুকে পড়েছে !
বাঁচিয়ে দিল !
যাক, রোভার্স তাহলে জেগে উঠেছে !
আঃ ! আঃ !
হলওয়ে জখম !
রয় তাহলে কাকে নামাবে ?
মার্ভিন তো শুনছি রেগে আছে !
তাকে নামিয়ে লাভ নেই !
অর্থাৎ রাসবুর্গ আজ জিতবেই !
সত্যি জিতবে ?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

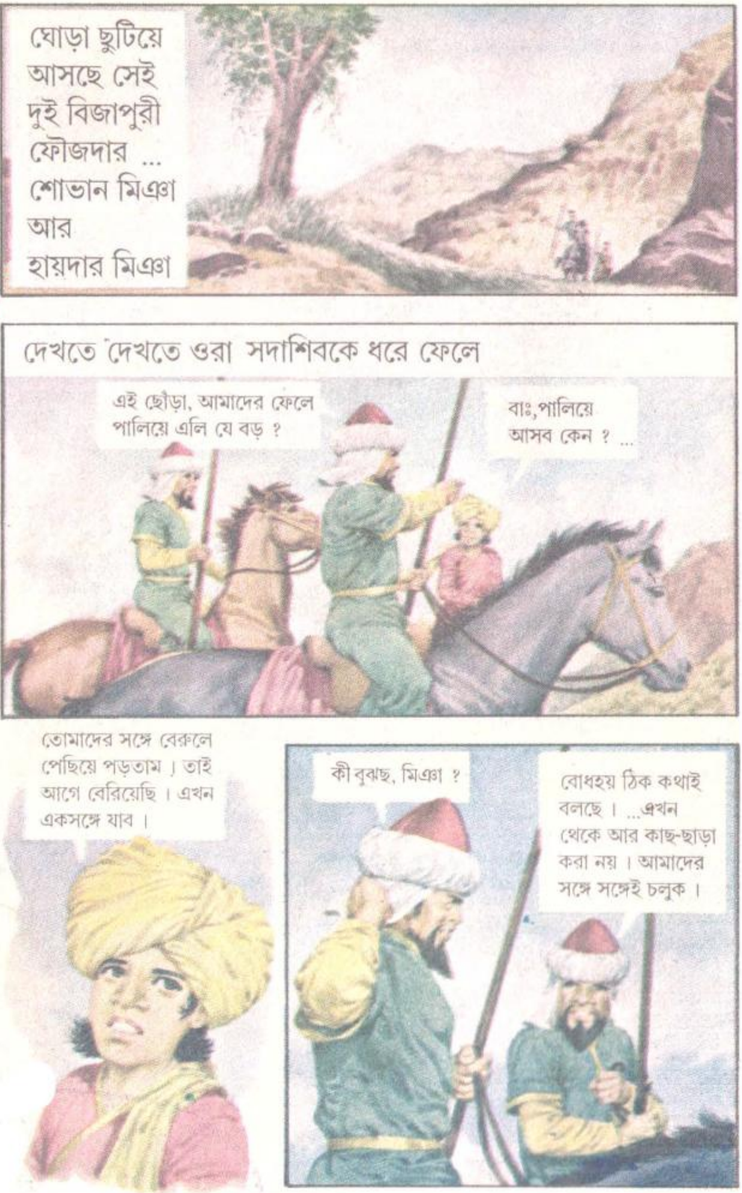
ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে সেই দুই বিজাপুরী ফৌজদার ... শোভান মিঞা আর হায়দার মিঞা
দেখতে দেখতে ওরা সদাশিবকে ধরে ফেলে
এই ছোঁড়া, আমাদের ফেলে পালিয়ে এলি যে বড় ?
বাঃ,পালিয়ে আসব কেন ? ...
তোমাদের সঙ্গে বেরুলে পেছিয়ে পড়তাম । তাই আগে বেরিয়েছি । এখন একসঙ্গে যাব ।
কী বুঝছ, মিঞা ?
বোধহয় ঠিক কথাই বলছে । ...এখন থেকে আর কাছ-ছাড়া করা নয় । আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলুক ।

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাশ

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

ফুটকি নিয়ে মজা

কানাড়া ব্যাংক-এর সেভিংস থেকে রাজু টাকা তুলল।
সে এবার এই টাকা দিয়ে কি কিনতে পারে—বলো দেখি! বিন্দুগুলো
সব যোগ ক'রে দাও—দেখতে পাবে।

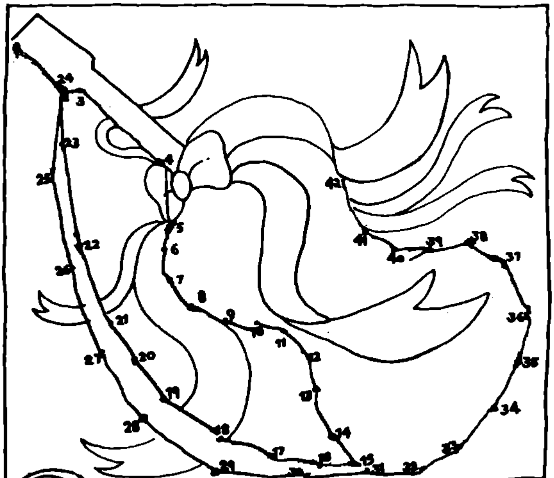

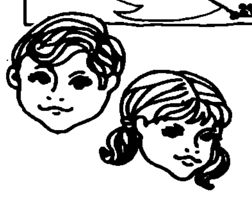

কানাড়া ব্যাংক

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)

মেধাবী ছাত্রদের জন্যে অপূর্ব সুযোগ

হও মেধাবী ছাত্র! হও উচ্চাকাঙ্ক্ষী!
মনে রেখো — তোমাদের মত
মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে
টাকা ধার দেয়—কানাড়া ব্যাংক।

গতমাসের রঙ করার
প্রতিযোগিতার ফলাফল

I PRIZE
Master Hemchandra
Vineeta Paper Backs
905, Near Officer's Rest House
Achnera (Agra District)

II PRIZE
Master Arup Datt
C/o Ashis Datt
2, M. Biswas Street
P.O. Krishnagar
Dist. Nadia—741 101
West Bengal

III PRIZE
Master Chunu Datta
C/o Nitya Gopal Dutta
Kathuria Para
P.O. Krishnagar
Dist Nadia
West Bengal

Plus one hundred consolation prizes

তুমি নাবালক।
তাতে কি হয়েছে?
তোমার মা-বাবাকে বলো—তোমার নামে কানাড়া ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে। তুমি যদি ১৪ বছরের হও তাহলে নিজেই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে ও লেনদেনও চালিয়ে যেতে পারবে। চলে এস, তোমার মধ্যে শিক্ষণ জাগাও। আজই চালু কর—মাত্র ৫ টাকা দিয়ে।

বিদ্যানিধি
তুমি কি হ'তে চাও? ডাক্তার? ইঞ্জিনিয়ার? বৈজ্ঞানিক? তাহলে তার ব্যবস্থা করে দেবে—বিদ্যানিধি। মা-বাবাকে বলো আজই একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে। তোমার উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে আর কোনো চিন্তাই থাকবে না।

বালক্ষেম
চালাক ছেলেমেয়েরা হাত-খরচার পয়সা পুরোটাই ব্যয় করেনা। কানাড়া ব্যাংকের টি. ভি. বাক্সে কিছু কিছু জমায়। তুমিও তাই করো। মা-বাবাকে বলো—কানাড়া ব্যাংকে একটা বালক্ষেম অ্যাকাউন্ট খুলতে। টি. ভি. বাক্সে খুচরো পয়সা ফেলতে থাকো; দেখবে—তোমার সঞ্চয় কেমন বেড়ে উঠবে! তোমার স্বপ্ন সফল হচ্ছে!

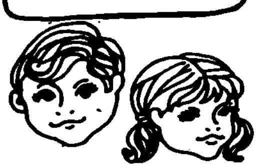

বিনামূল্যে! কানাড়া ব্যাংক-এর

স্টিকার

নিয়ে এস কানাড়া ব্যাংক-এর সেই শাখা থেকে যেখানে তোমার বালক্ষেম বা মাইনর অ্যাকাউন্ট আছে।

কানাড়া ব্যাংক
(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)

maa(s) CB 9 Ben b 82

শুরু হল

চাঁদে টিনটিন

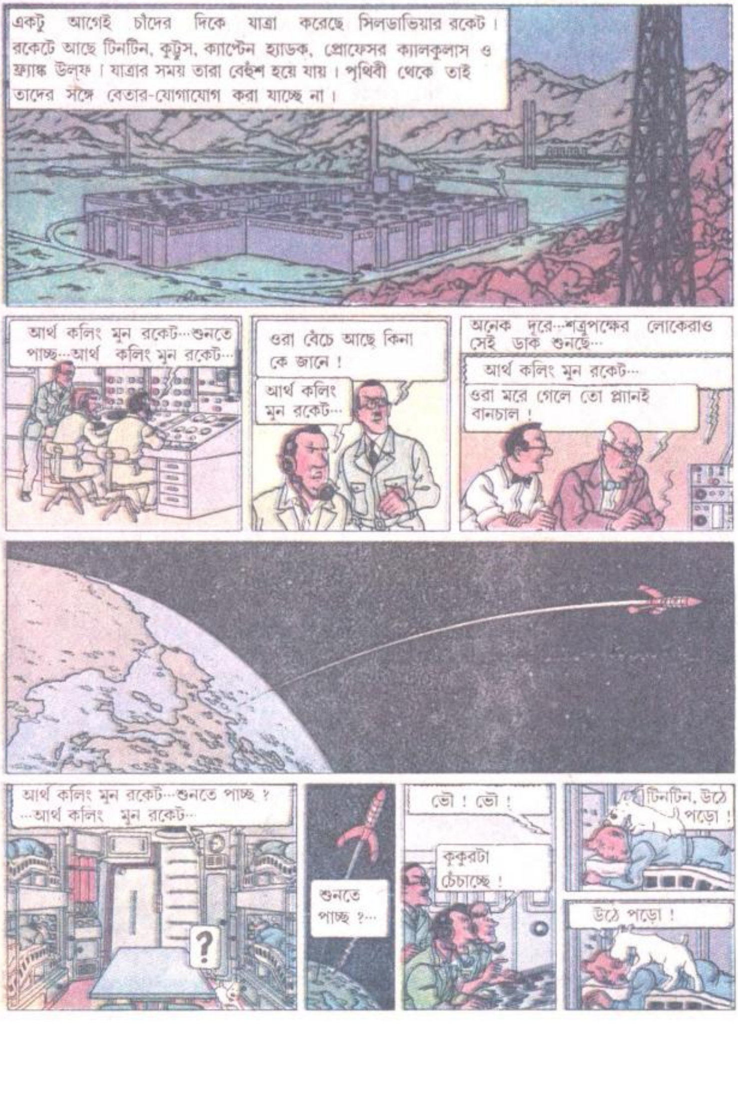

একটু আগেই চাঁদের দিকে যাত্রা করেছে সিলডাভিয়ার রকেট। রকেটে আছে টিনটিন, কুট্টুস, ক্যাপ্টেন হ্যাডক, প্রোফেসর ক্যালকুলাস ও ফ্র্যাঙ্ক উল্ফ। যাত্রার সময় তারা বেহুঁশ হয়ে যায়। পৃথিবী থেকে তাই তাদের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।
আর্থ কলিং মুন রকেট···শুনতে পাচ্ছ···আর্থ কলিং মুন রকেট···
ওরা বেঁচে আছে কিনা কে জানে!
আর্থ কলিং মুন রকেট···
অনেক দূরে···শত্রুপক্ষের লোকেরাও সেই ডাক শুনছে···
আর্থ কলিং মুন রকেট···
ওরা মরে গেলে তো প্ল্যানই বানচাল!
আর্থ কলিং মুন রকেট···শুনতে পাচ্ছ? ···আর্থ কলিং মুন রকেট···
?
শুনতে পাচ্ছ?···
ভৌ! ভৌ!
কুকুরটা চেঁচাচ্ছে!
টিনটিন, উঠে পড়ো!
উঠে পড়ো!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আরো
মর্টন খাওয়াও
খুশীর হাসি ছড়াও
কোকোনাট কুকিজ ● ল্যাক্‌টোবন্‌বন্‌ ● টফিজ
● কোকোনাট ক্রাঞ্চ এবং সফট্‌ সেন্টার্ড সুইটস্‌
● পিপারমিন্ট রোলস্‌ ● মিনিপপ্‌স্‌
MORTON
SWEETS OF DISTINCTION
মর্টন কনফেক্‌শনারী
এন্ড মিল্ক প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরী
পো: মাঢ়ৌরা (জিলা : সারন) বিহার
CC/M-5/81 BEN

রুআহা

বুদ্ধদেব গুহ

আগে যা ঘটেছে: পুব আফ্রিকায় পশু-চোরাইচক্রের সন্ধানে এসেছে ঋজুদা, রুদ্র ও তিতির। পুরনো শত্রু ভুষুণ্ডা দেখা দিয়েছে। আরুশার হোটেলে আচমকা হত্যাকাণ্ড। নাইরোবি-সর্দার ও দুই সাহেবের সঙ্গে নিভৃতে কথাবার্তা বলে ঋজুদা। যাত্রাপথে ওয়ানাবেরি নামের নিগ্রোটি এক দম-বন্ধ-করা কাহিনী শোনায়। গোপন অভিযানে ওরা রুআহা ন্যাশনাল পার্ক পেরিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁবু ফেলে। রাত্রে নানান জন্তুর উৎপাত, পরদিন সকালে বেবুনদের হৈহৈ কাণ্ড, তারপর আবার যাত্রা শুরু। গাছে-গাছে কারা যেন সাংকেতিক শব্দ চালাচালি করে। ওরা একটা শুকনো নদীতে জিপ নামিয়ে এগিয়ে চলে আর-এক পাহাড়ের দিকে। সেখানে গিয়ে একদল চরতে বেরুনো সিংহের গুহায় ঢুকে পড়ে। শত্রুচক্ষুর আড়ালে থাকার পক্ষে আদর্শ গুহা। সুতরাং এখানেই—কিন্তু ওরা কারা? একজন নীচে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করে আছে, আর দুজন শটগান নিয়ে গুহার দিকে উঠে আসছে। কিন্তু ঋজুদার শব্দহীন পিস্তলের অব্যর্থ গুলি খেয়ে তিনজনই লুটিয়ে পড়ে। তারপর—

॥ ১৮ ॥

হাতে সময় বেশি ছিল না। ঋজুদা সংক্ষেপে যা বলল গুহা ছেড়ে নেমে আসতে আসতেই শুনে নিলাম সব। ওদেরই জিপে আমি আর ঋজুদা ধরাধরি করে রক্তাক্ত লোক তিনটিকে তুলে দিলাম। তিতিরও এগিয়ে এসেছিল সাহায্য করতে কিন্তু অত রক্ত দেখে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠল। করেই সরে গিয়ে মাটিতে বসে পড়ল দু'হাতে মুখ ঢেকে।

আমি জানতাম এরকম হবে। ওর দোষ নেই। যখন শিকার করি তখনও ট্রফির ঘাড়ে বা বুকে দূর থেকে দারুণ মার্কসম্যানের মতো একখানা গুলি ঠুকে দিয়ে তাকে ধরাশায়ী হতে দেখে ভাল লাগে। নিজেকে নিজেই মনে মনে পিঠ চাপড়াই। কিন্তু তারপর শিকার করা জানোয়ারের কাছে যেতে বড়ই খারাপ লাগে। রক্ত বড় খারাপ দৃশ্য। কতবার মনে হয়েছে, প্রাণ নেওয়া তো সহজ, প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা কি আমার আছে? আর এ তো জানোয়ার নয়, এরা যে মানুষ; যারা পাঁচ মিনিট আগেও আমার চেয়েও অনেক বেশি জীবন্ত ছিল।

এত কথা ভাবলাম যতক্ষণে, ততক্ষণে ওদের জিপের স্টিয়ারিং-এ বসে আমি সেই বালিনদীর কাছে চলে এসেছি। কিন্তু আমরা যেখান দিয়ে নদী পেরিয়েছি সেখান দিয়ে পার হলে চলবে না। আমাদের ক্যাম্প ওদের দলের অন্যদের চোখে পড়ে যাবে। তাই নদীর পাড় দিয়ে আস্তে আস্তে চলেছি, নদীতে নামার মতো এবং উলটোদিকে ওঠার মতো জায়গা দেখলেই নামব। নদী পেরিয়ে জোর জিপ চালাতে হবে, দুটি কারণে। বেশি দেরি হলে জিপময় রক্ত ভরে গেলে, তা পথে চুঁইয়ে পড়বে। এবং রক্তের চিহ্ন রয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, মৃতদেহগুলো সমেত জিপটা অনেক দূরে কায়দা করে ফেলে রেখে আমাকে পায়ে হেঁটেই একা একা পথ চিনে ফিরে আসতে হবে গুহায়। যদি জঙ্গলে পথ হারিয়ে যাই! পথই তো নেই, তার পথ! সব জায়গাকেই পথ বলে মনে হয় এসব জায়গায়। যে-কোনো জঙ্গলেই।

জিপটা চালিয়ে মোটেই আরাম নেই। বোধহয় শক-অ্যাবসর্বার গেছে। সর্বক্ষণ ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ করছে এবং পেছনে

মরা মানুষগুলো সমেত যা-কিছু আছে সব কিছুই ঝাঁকাচ্ছে। নদীরেখাকে পাশে রেখে মাইল-দুয়েক গিয়ে একটা পথ পেলাম। এক্কেবারে ফার্স্ট ক্লাস। কোলকাতার রেড রোডের মতো। হাতিদের যাতায়াতের পথ। হাতিদের যাতায়াতের পথ দেখেই তো পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এঞ্জিনিয়াররা পথ বানান। হাতিদের মতো বুদ্ধিমান জানোয়ার বেশি নেই।

নদী পেরিয়ে এলাম। একবার পিছনে তাকালাম। টেডিমহম্মদ পাহাড়টা ভাল করে দেখে নিলাম। নদী আর পাহাড়টার মাঝে মস্ত একটা বাওবাব গাছ আছে। ফেরার পথে এই গাছটাকে দেখেই নিশানা ঠিক করতে হবে। পূর্ণিমা চলে গেছে আরুশাতেই। চাঁদ উঠবে সেই শেষ রাতে। তারার আলো আর আমার তিন-ব্যাটারির টর্চই একমাত্র ভরসা। সামনে তাকালে জঙ্গলের মাথার উপরে দিগন্তে কিমিবোওয়াটিঙ্গে পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। ঋজুদা বলেছিল, যে পথ ছেড়ে দিয়ে কাল আমরা এসেছি, সেই বড় পথের উপরে জিপটাকে রেখে দিয়ে আসতে। যাতে লোকগুলোর সঙ্গীরা অথবা ন্যাশানাল পার্কের লোকেরা তাদের দেখতে পায়। নইলে হায়নায় আর শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে এদের। শকুনও আছে। যদি এরা কাছাকাছি গাঁয়ের লোক হয় তাহলে কবর পাবে অন্তত। ঋজুদার তো বটেই, আমারও খারাপ লাগছিল ভীষণ। প্রথমেই তিন-তিনটি মানুষ খুন করতে হল। অথচ আমরা নিরুপায়। জঙ্গলের নিয়ম হচ্ছে 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট'। হয় মারো, নয় মরো। মাঝামাঝি রাস্তা এখানে কিছু খোলা নেই।

দুপাশে ক্যাণ্ডালাব্রা ঝোপ। বড় বড় কম্মিফোরা গাছ। একরকমের কম্মিফোরা আছে তাদের বলে কম্মিফোরা উগোজেন্‌সিস্। হেহেদের মতো গোগো বলে একরকমের আফ্রিকান উপজাতি আছে। তারা যেখানে থাকে সে অঞ্চলকে বলে উগোগো। ঐ অঞ্চলে এজাতীয় কম্মিফোরা বেশি দেখা যায় বলে ঐ গাছের ঐরকম নাম হয়েছে। কম্মিফোরা ছাড়াও কম্‌ব্রেটাম, অ্যাকাসিয়া এবং অ্যাডানোসোনিয়া জাতের গাছ আছে। এই অ্যাডানোসোনিয়াই হল বাওবাব। যাদের আরেক নাম "আপসাইড-ডাউন ট্রিজ"। ব্রাকিস্টেগিয়া গাছেদের মতোই বছরের বেশির ভাগ সময়ই এরা পাতাহীন থাকে। কিন্তু বৃষ্টি নামার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এরা বুঝতে পারে যে, বৃষ্টি আসছে। তখন পাতা ছাড়তে থাকে। বৃষ্টির জল যাতে সারা বছরের মতো ধরে রাখতে পারে। প্রকৃতি যে কত রহস্যই গোপন করে রাখেন তাঁর বুকের মধ্যে তার খোঁজ কজন রাখে ?

ন্যাড়া-মুখের কতগুলো 'গো-অ্যাওয়ে' পাখি গাছের ডাল বেয়ে কাঠবিড়ালির মতো দৌড়ে উপরে উঠে গেল জিপটা দেখে। এদের গায়ের পালক হালকা ছাই আর

সাদাটে-সবুজ রঙের হয়। এরা হচ্ছে টুরাকো জাতীয় পাখি। সামনেই একটা নাম-না-জানা গাছের নীচে প্রকাণ্ড একটি ইল্যাণ্ড ছবির মতো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরা হরিণ নয়। অ্যান্টিলোপ। সোয়াহিলিতে এদের বলে পফু। লম্বাতে প্রায় ছ' ফিটের মতো হবে। ওজনেও কম করে সাত কুইন্টল হবে কম-সে-কম। জিপ দেখেও ইল্যাণ্ডটা পালাল না। একটু নড়েচড়ে উঠল শুধু। ওর পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন দেখি, কে বা কারা শটগান দিয়ে গুলি করে তার চোখদুটোকে খতম করে দিয়েছে। বুকেও একটা দগদগে ক্ষত। এক্ষুনি হয়তো পড়ে মরে যাবে। যারা এমন নৃশংস হতে পারে, তাদের মেরে ঋজুদা কিছুই অন্যায় করেনি। মনটা একটু হালকা লাগতে লাগল।

ঋজুদা প্রায়ই একটা কথা বলে। চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াসের কথা। বলে, "ইফ উ্যু পে ইভিল উইথ গুড, হোয়াট ডু উ্যু পে গুড উইথ ?" আমাদেরও এরকম কথা আছে, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। যে শঠ, তার সঙ্গে শঠতা করলে দোষ নেই। যে মন্দ, তাকে মন্দ ব্যবহারই দিতে হয়। আর ভালকে ভাল।

ঘন্টা-দুয়েক জিপ চালিয়ে আসছি। কেবলই ভয় হচ্ছে, রাস্তা হারালাম না তো! ফিরতে পারব তো পথ চিনে ? এদিকে সেই বড় রাস্তাও একেবারে বেপাত্তা।

জিপটা একটু আড়াল দেখে দাঁড় করালাম। পিঠের রাক-স্যাক থেকে ম্যাপটা বের করে দেখলাম। কম্পাসটা বের করে তার সঙ্গে মিলিয়ে মনে হল আমি যেন বেশি চলে এসেছি ইবিগুজিয়া নদীর দিকে। সর্বনাশ হয়েছে। আমাকে কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে তো নির্ঘাত ফাঁসিতে লটকে দেবে। আইন নিজের হাতে নেওয়ার অধিকার কারোই নেই। অথচ এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে, যারা কোনো আইনেরই ধার ধারে না, তাদের সঙ্গে আইন মেনে টক্কর দেওয়ারও কোনো উপায় নেই।

এমন সময় হঠাৎ একটা জিপের শব্দ কানে এল। (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

LINTAS-SU-253-1812 BG
হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

পিকনিক

অশোক হালদার

রকমারি রান্নার ঝকমারি রাঁধুনি।
খোশবাই-পক্ষী যে দাঁড়ছুট, কাঁদুনি
জিভে টইটম্বুর, বানভাসি হাঁ-গালে—
আগাম, রাঁধুনি ওহে! লাগাম না বাগালে,
উথাল-পাথাল ঐ বেওয়ারিশ পক্ষী
বশে রাখা কী যে বিতিকিচ্ছিরি ঝক্কি।

ঝকমারি রাঁধুনি গো, খাঁচা আনো শিগ্রি,
নয় খোদ ডেকচিটা করে দাও বিক্রি,
চৈনিক মোগলাই খানা যাই থাক-না
পক্ষীর সাধ্য কি ঝাপটাবে পাখনা?
মাংসের কোর্মা দো-পেঁয়াজি কি মৎস্য—
কেয়াবাত পিকনিক...মা-বাবা সবৎস।

ছবি : অনূপ রায়

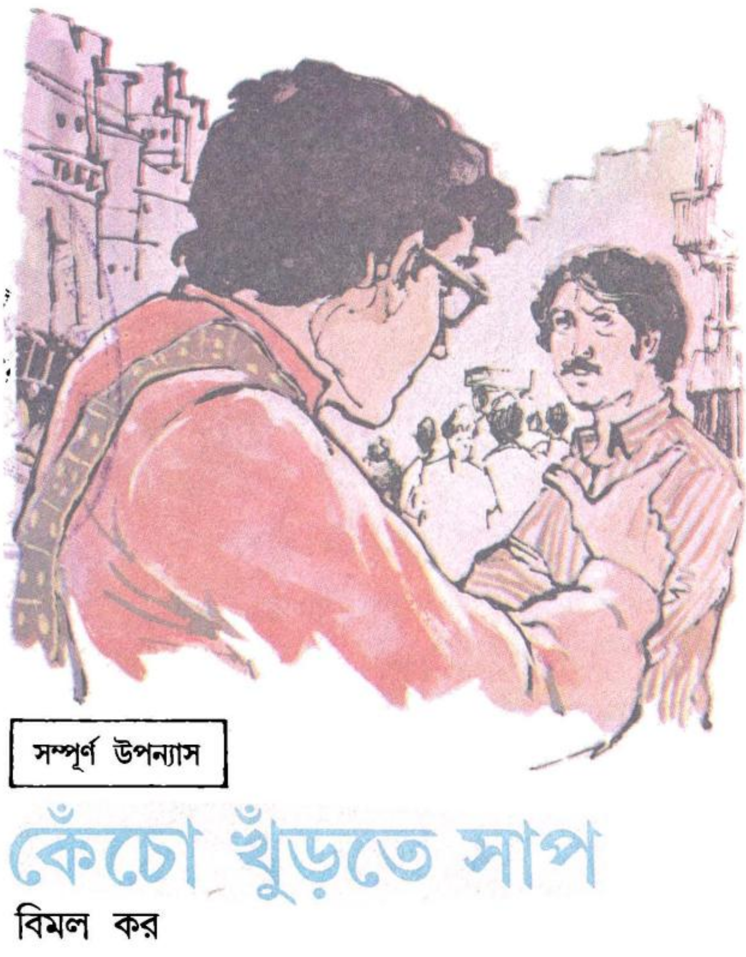

সম্পূর্ণ উপন্যাস

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

বিমল কর

আমার নাম জীবনলাল ; জীবনলাল দত্তগুপ্ত। ওটা আমার আসল নাম। একটা নকল নামও রয়েছে। লালা দত্ত। আমার আসল নাম যত লোক জানে, নকল নামটা তার চেয়েও বোধ হয় বেশি লোক জানে। হয়তো আপনিও জানেন, বা শুনেছেন। না শুনলেও ক্ষতি নেই। আমি মোটেই কেষ্টবিষ্টু গোছের লোক নই। একেবারে সাধারণ, চুনোপুঁটি। তবু যে বলছি, শুনলেও শুনে থাকতে পারেন নামটা, তার কারণ আমি একজন গোয়েন্দাগল্পের লেখক। লালা দত্ত এই নামে 'শিহরন' সিরিজের গোয়েন্দাবই লিখি। না না করেও আমার বইয়ের সংখ্যা প্রায় কুড়ি।

নিজের কথা এখানে সামান্য বলে নেওয়া দরকার। গোয়েন্দাগল্প লেখাটা আমার পেশা নয়, শখ। আমার পেশা কেরানিগিরি। ট্রাম কম্পানিতে চাকরি করি। থাকি মেসে। আমাদের মেসবাড়িকে কোলে বাজারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হট্টখানা। ওরই মধ্যে কোনো রকমে থাকা খাওয়া—এই আর কি!

আমার বাবা নেই। মা থাকেন দেশের বাড়িতে। ছোট ভাই—সেও দেশের বাড়িতে থাকে, প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। নিজের ঘরবাড়ির কথা বেশি বলে লাভ নেই। একসময় একরকম ভালই কেটে যাচ্ছিল, বাবা মারা যাবার পর বড় কষ্টে পড়েছিলাম। তখন আমি কলেজে পড়তাম। আট-দশ বছর লড়ালড়ি করে এখন খানিকটা থিতু হয়েছি। আমার বয়েস হয়েছে তিরিশ।

গোয়েন্দাগল্প লেখার শখ আমার আগে ছিল না। তবে হ্যাঁ—দেদার গোয়েন্দাগল্প পড়তাম। আমার বন্ধু পশুপতি আমার চেয়েও গোয়েন্দাগল্পের পোকা ছিল। একবার সে একটা গল্প লিখতে শুরু করে আর শেষ করতে পারল না। আমাকে দিয়ে শেষ করাল লেখাটা। সেই লেখাটা 'কালসর্প' নামে ছাপা হল পানুবাবুর প্রেস থেকে। কিছু বিক্রিও হল।

তখন থেকেই আমার শখ চাপল গোয়েন্দাগল্প লেখার। পশুপতি আমায়, যাকে বলে মদত, তাই দিতে লাগল। আমি ধীরে ধীরে গোয়েন্দাগল্পের লেখক হয়ে উঠলাম।

পশুপতির কথা এখানে একটু বলতে হয়। পশুপতি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা বর্ধমানের লোক। কাছাকাছি গ্রামের ছেলে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে কলেজেও পড়েছি। পশুপতির বরাবর সাধ ছিল সে উকিল হবে। গ্রহের ফেরে তার উকিল হওয়া হল না। তার মামা, আমরা যাঁকে বলি সদানন্দমামা, পশুপতিকে হোটেলের ব্যবসায় ঢুকিয়ে নিজে চলে গেলেন

মনসাগ্রামে আশ্রম খুলতে। মামার নিজের বলতে এক পশুপতিই ছিল। আমার তো মনে হয়, এতে শাপে বর হয়েছে। পশুপতির যে-ধরনের মাথাগরম ধাত, তাতে তার উকিল হওয়া চলত না।

শিয়ালদা-হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি যত হোটেল আছে তত হোটেল আর কোথায় আছে আমি জানি না। পশুপতি হল দয়াময়ী হোটেলের ম্যানেজার। মালিকও বলা যায়। খাতায়পত্রে মামা এখনও মালিক, কিন্তু মামার অবর্তমানে পশুপতিই মালিক হবে।

আগেই বলেছি, আমি যে মেসে থাকি সেটা একটা জঘন্য জায়গা। হইচই, গলাবাজি, লাঠালাঠি লেগেই থাকে। একটু নিশ্চিন্তে শোওয়া-বসার উপায় নেই। দু' দণ্ড আপনমনে থাকব—তার জো নেই।

এইসব কারণে আমি একটা অভ্যেস করে নিয়েছিলাম। যখন কোনো লেখা শুরু করতাম, তখন আর মেসে থাকতাম না, পশুপতির হোটেলে এসে ডেরা বাঁধতাম। সাত দিন আট দিন, এমন কী দিন দশেকও একটানা হোটেলে থেকে লেখা শেষ করে, বেশির ভাগ প্রুফটা দেখে দিয়ে তবে হোটেল ছাড়তাম। এ-ব্যাপারে পশুপতির ঢালাও হুকুম ছিল, আমি যখনই আসব পুব দিকের ছোট ঘরটা পাব হোটেলের, দোতলার ঘর। আমার খাওয়া-দাওয়া, ফাইফরমাস খাটা, চা পান সিগারেটের ব্যবস্থা করে দেবার যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

পশুপতি এই রকমই। আমায় যতটা ভালবাসে, ততটাই তার দাপট দেখানোর পাত্র করে তুলেছে। ওর কথা না মেনে আমার উপায় নেই। আমার কাছে টাকাপয়সা নেবে না। এ নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়াও হয়েছে খুব। আমি ওর সঙ্গে ঝগড়ায় হেরে গিয়েছি। তবে হ্যাঁ, আমি এক জায়গায় জিতেছি। ও আমাকে মেস ছাড়িয়ে তার হোটেলে এনে রাখতে পারেনি।

ব্যাপারটা এখন এই রকম দাঁড়িয়েছিল : আমি দু-তিন মাস অন্তর একবার করে পশুপতির হোটেলে এসে উঠতাম। আট দশ দিন থাকতাম একটানা। একটা বই লিখে, তার প্রুফ দেখে আবার ফিরে যেতাম আমার মেসে। তার মানে এই নয় যে, পশুপতির কাছে আমি অন্য সময়ে আসতাম না। তা আসতাম। হপ্তায় বার দুই এসে তার খোঁজখবর করে যেতাম। পশুপতিই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু—তার কাছে না এসে থাকব কেমন করে ?

আর মাত্র দুটো কথা বলে আমার গল্প শুরু করব।

আমি সাত-আট দিনে একটা বই লিখতে পারি ভেবে আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছেন। এতে অবাক হবার বেশি কিছু নেই। প্রথমত, আমি যা লিখব, মানে গল্পটা, মনে মনে আগেই সাজিয়ে নিতাম। দু' তিন মাস ধরে এটা চলত। তারপর ঝপ করে একদিন কাগজ কলম নিয়ে বসতাম। চলে আসতাম পশুপতির হোটেলে। আমি তাড়াতাড়ি লিখতে পারি। তা ছাড়া, বসতাম যখন ঘাড় গুঁজে, টানা লিখে যেতাম সকাল দুপুর। আমি শখের গোয়েন্দাগল্পের লেখক—আমার হুড় হুড় করে লিখতে আটকাবে কেন ! আর লেখা তো বড়জোর সোয়া শ' পাতা। ছাপা হলে দাঁড়াবে নব্বই ছিয়ানব্বই। পানুবাবু তাকে শ'খানেক পাতায় দাঁড় করাতেন। পানুবাবু আমাদের পুরনো চেনাজানা লোক। তাঁর প্রেসেই আমার বইয়ের কাজ হত বরাবর। তিনি অন্য কাজ সরিয়ে আমার কাজটা করে দিতেন। কখনও অন্যথা করেননি।

গত চার-পাঁচ বছর এইভাবেই আমার বই লেখা চলছিল। লালা দত্ত এই নামে 'শিহরন' সিরিজের পনেরো-কুড়িটা বইও লিখলাম। প্রতি বই পিছু সাতশো টাকা পাই এখন। আগে পাঁচশো পেতাম। আমার এতে দুঃখ ছিল না। কিছু তো পাই।

'তারিণী লাইব্রেরি'র মহিমবাবুর যতই বদনাম থাক, আমার সঙ্গে কোনো গোলমাল করেননি। উনিই 'শিহরন সিরিজ'-এর প্রকাশক।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটা অঘটন ঘটল। সেটাই বলি।

॥ দুই ॥

দিনটা ছিল শনিবার।

সেই সকাল আটটায় কলম নিয়ে বসেছিলাম। উঠলাম যখন তখন দুপুর দেড়টা। লেখা শেষ। নিশ্চিন্ত।

স্নান খাওয়া শেষ করে যখন পান মুখে বিছানায় শুতে এলাম, তখন আড়াইটে বেজে গিয়েছে।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে লেখার শেষটা মনে মনে ভাবছিলাম। মনে হল, মন্দ হয়নি। গত রবিবার লেখা শুরু করেছিলাম। ঠিক সাত দিনে শেষ হল। অবশ্য এই লেখাটা একটু ছোট। আশি পঁচাশি পাতা হতে পারে। গত সোমবার থেকেই আমি পানুবাবুকে কপি দিচ্ছি। মঙ্গলবার থেকেই প্রুফ পাচ্ছি। মঙ্গলবারে পেয়েছি সামান্য। বুধবারে খানিকটা। শেষ বারো-চোদ্দ পাতা বাকি ছিল লেখার। আজ শেষ করলাম। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার থেকে আমি কোনো প্রুফ পাইনি। গতকাল হোটেলের বলাইকে দিয়ে পানুবাবুর প্রেসে কপি পাঠিয়েছি। পানুবাবুর প্রেস থেকে নিধু বলে এক ছোকরা সন্ধের মুখে কালিঝুলি মাখা, ভিজে স্যাঁতসেঁতে এক বাণ্ডিল প্রুফ আমায় দিয়ে যায়। সে বৃহস্পতিবার আসেনি, গতকালও নয়। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। পানুবাবুর প্রেসে কি কম্পোজ হচ্ছে না? নাকি নিধুর অসুখবিসুখ হল? বলাইকে বলেছিলাম খোঁজ আনতে! সে হোটেলে কাজ করে, প্রেসের ব্যাপার বোঝে না। ফিরে এসে কিছুই বলতে পারল না।

ভাবলাম, আজ সন্ধেবেলায় নিধু আসবে। প্রুফ আনবে। তার হাতেই শেষ কপিটা দিয়ে দেব। কাল অবশ্য রবিবার। প্রেস বন্ধ। দেখা যাক নিধু কী বলে!

সন্ধেবেলায় পশুপতির সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে আটটা বেজে গেল। নিধু এল না।

পশুপতি বলল, "পুজোর পর তো! পানুবাবুর হাতে স্কুলের বইয়ের কাজ। বোধ হয় আটকে গেছেন। সোমবার নিশ্চয় পাঠাবেন।"

"সোমবার আমি থাকব না। কাল বিকেলেই মেসে ফিরে যাব।"

"সোমবার সন্ধেবেলায় এসে খোঁজ করে যাস।"

এ-রকম হামেশাই হয়। আমি মেসে ফিরে যাবার পর পশুপতির কাছে পানুবাবু প্রুফ পাঠিয়ে দেন। আমি পশুপতির হোটেলে এসে প্রুফটা দেখে দিয়ে যাই। মেসে বসে এ-সব কাজ করি না আমি। মেসের দু' একজন ছাড়া কেউ জানেই না আমি শখের লেখক।

পশুপতির অফিসঘরে বসেই গল্পগুজব হচ্ছিল। পানুবাবুর কথা তুলে রেখে আমরা অন্য কথাবার্তা বলতে লাগলাম। পশুপতি তেতলায় একটা ঘর বাড়াবার কথা ভাবছে। তার হোটেলটা দোতলা। নীচে রান্নাবান্না, ঠাকুর-চাকর, খাবার ঘর—এই সব। দোতলায় ছোট আর মাঝারি মিলিয়ে গোটা বারো ঘর। হোটেলের ঘর বলতে যা বোঝায়। তেতলায় একটা মাত্র ঘর। সেই ঘরে পশুপতি নিজে থাকে। আর একটা ঘর না বাড়ালে চলছে না। হোটেলের স্টোর রুমটা সে তেতলায় করবে।

ন'টা বেজে গেল।

পশুপতি বলল, "চল, ওপরে যাই। গজলের একটা নতুন রেকর্ড কিনেছি—তোকে শোনাব।"

পশুপতির আবার গানবাজনার ওপর খানিকটা টান আছে।

আমরা উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি

পানুবাবু। কলকাতায় ঠাণ্ডা পড়েনি, তবু পানুবাবুর গায়ে একটা সুতির চাদর। ঘরে এলেন এমন ভঙ্গিতে মনে হল যেন অসুস্থ। মুখ থমথমে।

আমি ভাবলাম পানুবাবু বুঝি নিজেই প্রুফের তাড়া বয়ে এনেছেন।

"আসুন পানুবাবু! বসুন। বৃহস্পতিবার থেকে আমি প্রুফ পাচ্ছি না! কী ব্যাপার?"

পানুবাবু চেয়ারে বসলেন। বললেন, "আর প্রুফ? আপনারা কিছু শোনেননি?"

আমরা মাথা নাড়লাম। কিছুই শুনিনি।

পানুবাবু বললেন, "মহিমবাবু আর নেই।"

আমরা চমকে উঠলাম। মহিমবাবু মারা গিয়েছেন। সে কী! তাঁর তো বেশি বয়েস হয়নি। কোনো অসুখ-বিসুখ তাঁর ছিল বলে জানি না। শুধু চোখের ব্যাপারে তাঁর একটা অসুখ ছিল। কম দেখতেন। সন্ধের দিকে একরকম রাতকানাই হয়ে যেতেন।

পশুপতি বলল, "মারা গিয়েছেন? কবে?"

"কাল," পানুবাবু বললেন, "শুক্রবারে। কাল মহিমবাবু রোজকার মতন তাঁর দোকানে এসেছিলেন। কাজকর্মও করেছেন। স্কুল সিজনের কাজ চলছে বলে দোকান থেকে উঠতে উঠতে আটটা বেজে যায়। কর্মচারীরা দোকান বন্ধ করার পর মহিমবাবু রোজকার মতনই তাঁর চেনা এক রিকশাঅলাকে ডেকে রিকশায় ওঠেন। চেনা রিকশাঅলাদের কিছুই বলতে হত না। তারা মহিমবাবুকে বাড়ি পৌঁছে দিত। হাত ধরে নামিয়ে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিত।...কাল যে রিকশাঅলা মহিমবাবুকে নিয়ে গিয়েছিল সে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যখন মহিমবাবুকে নামাতে গেল, দেখল রিকশার একদিকে গা-মাথা হেলিয়ে তিনি পড়ে আছেন। কোনো সাড়া-শব্দ দিচ্ছেন না।"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "সে কী? রিকশাতেই?"

"হ্যাঁ। লোকজন, ডাক্তারবদ্যি সবই এল। কিন্তু সব শেষ। বাঁচানোর কোনো চেষ্টাই করা গেল না।...আগেই মারা

গিয়েছেন।"

পশুপতি যেন হায় হায় করে উঠল। "ইশ্‌! এভাবে মানুষ মারা যায়? হার্টফেল?"

"মহিমবাবুর হার্টের কোনো অসুখ ছিল বলে শুনিনি। উনি তো আমার অনেক পুরনো খদ্দের। বছর পনেরো ওঁর সঙ্গে কারবার করছি। বন্ধুর মতন হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের কথাও বলতেন। ওঁর দোষের মধ্যে দেখেছি একটু তিরিক্ষে ধরনের, ঠোঁটকাটা, আর খানিকটা কৃপণ। এ-ছাড়া ওঁর কোনো দোষ দেখিনি। বিয়ে-থা করেননি, ভাইপো ভাগ্নেদের মানুষ করেছেন।"

আমার ভাল লাগছিল না। পানুবাবুর কথা মন দিয়ে শুনছিলাম না সব। মহিমবাবুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ভালই ছিল।

পানুবাবু বললেন, "সবচেয়ে বড় কথা হল, মহিমবাবুর ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি। ডাক্তার দিতে রাজি হয়নি। ফলে...।"

কথাটা আর শেষ করতে হল না পানুবাবুকে, পশুপতি আর আমি দুজনেই আঁতকে উঠে বললাম, "পোস্ট মর্টেম?"

"হ্যাঁ। আজ বডি দেয়নি। কাল রবিবার, কাল যদি দেয়। কী জানি!"

"গোলমেলে কেস নাকি?" পশুপতি বলল।

"কেমন করে বলব?" পানুবাবু বললেন, "সুস্থ লোক, রিকশায় করে বাড়ি ফিরছে। রাস্তার মধ্যে হুট করে মারা যাবে, কে ভাবতে পারে। ডাক্তারও পারেনি। শুনলাম ডাক্তার নাকি বলেছেন, তিনি যখন পেশেন্টকে দেখেছেন তখন পেশেন্ট ডেড। কাজেই তিনি কোনো সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না।"

আমরা কোনো কথা বললাম না। আবহাওয়াটা কেমন পালটে গেল পানুবাবুর মুখে দুঃসংবাদ শোনার পর থেকেই।

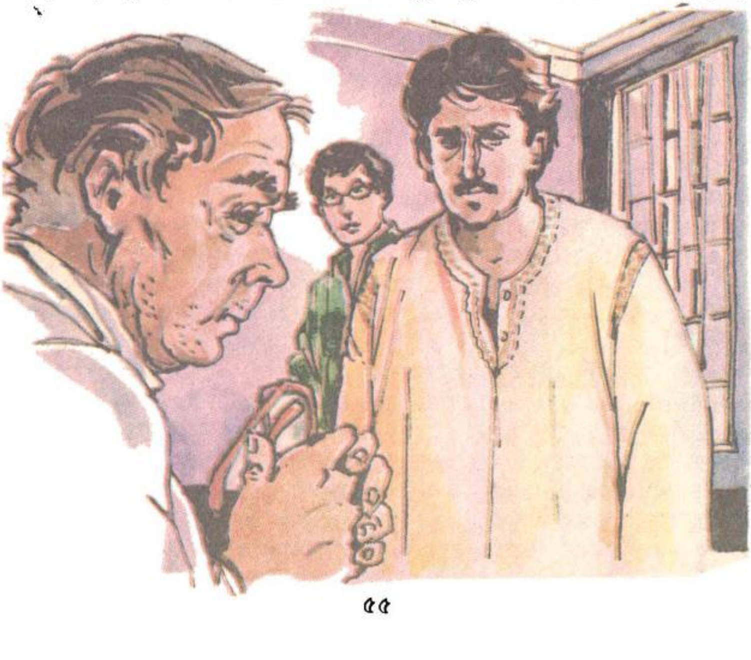

মহিমবাবুর মুখ মনে পড়ছিল। তাঁর সেই সাদামাটা পোশাক, খদ্দরের পাঞ্জাবি আর মিলের ধুতি। চশমা পরতেন সাবেকি ধরনের।

পানুবাবু বললেন, "আজ সারাটা দিনই ঝঞ্ঝাটে ছিলাম। বাড়ি ফেরার পথে ভাবলাম, আপনারা হয়তো খবরটা জানেন না। খারাপ খবর, তবু জানিয়ে যাই।"

পশুপতি বলল, "ভাল করেছেন। আমরা কিছুই জানতাম না। জানলে মহিমবাবুর বাড়িতে যেতাম। কাল একবার যাব।"

পানুবাবু খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর এক গ্লাস জল খেতে চাইলেন।

পশুপতি জল আর চায়ের জন্যে হাঁক মারল।

মাথা নাড়লেন মহিমবাবু, "না, চা আর খাব না। অনেকবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।" বলে উনি আমার দিকে তাকালেন। "আপনার কাজকর্ম এখন বন্ধ রাখব কি না বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় বইটা শেষ করে দিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। আবার ভাবছি, সামান্য দুটো ফর্মা আটকে রেখেই বা কী হবে! শেষ হয়ে গেলে তবু অন্তত ছাপা ফর্মাগুলো থাকবে। আপনি কী বলেন জীবনবাবু?"

আমি বললাম, "লেখা আমি আজ শেষ করে দিয়েছি। ভাবছিলাম নিধু এলে তার হাতে শেষ কপিটা দিয়ে দেব।"

"নিধু? কোথায় সে?" পানুবাবু বললেন, । "সে তো আসছে না ক'দিন?"

"বুধবার এসেছিল। আমি তাকে বসিয়ে রেখে খানিকটা প্রুফ দেখে দিয়েছিলাম। কপিও দিয়েছিলাম পাতা-কুড়ি।"

"সে কী! সেই প্রুফ তো সে ফেরত দেয়নি। কপিও না।" পানুবাবু কপাল চুলকোলেন। "আপনাকে প্রেস থেকে বোধ হয় বারো-চোদ্দ গেলি প্রুফ পাঠানো হয়েছিল দ্বিতীয় বারে। সে প্রুফ আমরা ফেরত পাইনি।"

জল এসেছিল।

পানুবাবু জল খেলেন।

"আমি তা হলে উঠি পশুপতিবাবু।" পানুবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "মনে মনে একটা ভয় হয়ে গেছে, মশাই। কে জানে এই হয়তো শেষ জল খাওয়া! না না, অবাক হবেন না। এইরকম হয়। মহিমবাবু রিকশায় উঠে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন খাবেন বলে! সিগারেটটা আর খেতে পারেননি। মুখ থেকে পড়ে গিয়েছিল কোলে। শুনলাম জামাটা সামান্য পুড়ে গিয়েছিল। এই তো মানুষের জীবন। এক মুহূর্ত আগে আছে, পরের মুহূর্তে নেই।"

হঠাৎ যেন আমার বুকের ওপর বিরাট কোনো ঘা লাগল। মাথার মধ্যে কী যেন হয়ে গেল। গলা বন্ধ-বন্ধ হয়ে আসছিল। "কী বললেন? কোলের ওপর সিগারেট? পোড়া সিগারেট?"

"হ্যাঁ। শুনেছি প্রায় গোটা সিগারেট।"

আমি যেন ভূত দেখার মতন চোখ করে পানুবাবুকে দেখতে লাগলাম।

পানুবাবু আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন।

॥ তিন ॥

পানুবাবু চলে গেলে আমি বেহুঁশের মতন বসে থাকলাম। সবই কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এমন কি হয় নাকি? গল্পের ঘটনার সঙ্গে জীবনের ঘটনা মিলে যায়? আশ্চর্য!

"পশুপতি?"

"বল?"

"এ কেমন করে হল? ...আমি যে বইটা সবে শেষ করলাম, তাতে একেবারে এই জিনিস?"

পশুপতি কিছুই বুঝতে পারল না। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"অদ্ভুত ব্যাপার! স্ট্রেঞ্জ! আমি ভাবতেই পারছি না। একেবারে এক ধরনের

মার্ডার ।" আমার গলার স্বর নিজেরই কানে লাগল । ভয় পেয়েছি, না উত্তেজিত হয়ে উঠেছি ! চোখকান জ্বালা করে উঠছিল ।

পশুপতি বলল, "কী বলছিস পাগলের মতন ! একই ধরনের মার্ডার মানে !"

"একই ধরনের । সেম্ । ...তুই... তোকে আমি বলছি, বিশ্বাস কর । আমার এই শেষ বইটায় আমি একটা খুনের কথা লিখেছিলাম । একটা সত্তর বছরের বুড়ো, অগাধ তার সম্পত্তি, হাড়কেপ্পন । তাকে তার ভাইপো এইভাবে খুন করবে । সিগারেটের পাতার মধ্যে বিষ মেশানো থাকবে । বুড়ো দুটো-তিনটে টান মারার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ ।"

পশুপতি আমার দিকে বোকার মতন তাকিয়ে থাকল । "বুঝলাম না !" পশুপতি বলল, "তোর গল্পের বুড়ো যেমন ভাবেই মরুক—তার সঙ্গে মহিমবাবুর সম্পর্ক কী !"

"তুই বুঝতে পারছিস না ! তুই কী রে ! মহিমবাবুকেও তো একইভাবে মারা হয়েছে ।"

পশুপতি হেসে উঠল । "তোর মাথা । কোথায় তোর বইয়ের গল্প আর কোথায় রিয়েল ব্যাপার !"

"তুই বিশ্বাস করছিস না ! আমি সত্যি বলছি, আমার গল্পে আমি একটা নতুন ধরনের মার্ডার ঢুকিয়েছিলাম । মানে, এমনভাবে খুন করা হবে যাতে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না । মনে হবে, হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ফেল । তুই ভেবে দ্যাখ, এখানেও তাই করা হয়েছে । মহিমবাবু সুস্থ অবস্থায় রিকশায় উঠে বাড়ি ফিরছিলেন । দোষের মধ্যে তিনি একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন । দু' চারটে টানও দিতে পেরেছিলেন কিনা কে জানে ! হাত থেকে সিগারেট গড়িয়ে পড়ল, তিনিও ঢলে পড়লেন রিকশায় ।"

পশুপতির এতক্ষণে যেন মাথায় গেল আমি কী বোঝাতে চাইছি । আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ । তারপর বলল, "তোর এই নতুন বইটায় এরকম ছিল !"

"হ্যাঁ ।"

"তুই কি বলতে চাইছিস তোর বইয়ের গল্পের সঙ্গে মহিমবাবুর মারা যাবার সম্পর্ক আছে ?"

"তা জানি না, ভাই। তবে বড় অদ্ভুত লাগছে। আমার লেখার প্রুফ আজ তিন দিন ধরে পাচ্ছি না। নিধু বেপাত্তা। অথচ এই রকম একটা কাণ্ড হয়ে গেল।"

পশুপতি হাত তুলে আমায় চুপ করতে বলল। বলে কী যেন ভাবতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বলল, "দাঁড়া, ব্যাপারটা বুঝতে দে। তুই কি বলতে চাস তোর গল্পের খুন দেখে, বা ধর পড়ে, কেউ একজন মহিমবাবুকে খুন করেছে ?"

"তাই তো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা।"

"দাঁড়াচ্ছে বললেই হবে নাকি ? যুক্তি কোথায় ?"

আমি বললাম, "তুই ভেবে দেখ না ! পানুবাবুর মুখেই শুনলি—আমার দেখে দেওয়া প্রুফ তাঁর প্রেসে পৌঁছয়নি। নিধু পৌঁছে দেয়নি। সে প্রেসে যাচ্ছে না।"

"এ-থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। তোর কাছে যে কপি আর প্রুফ এসেছিল, তুই দেখে দিয়েছিস বলছিস, সেটাতে কী ছিল ?"

"এইরকম খুনের কথা।"

"একেবারে গোড়াতেই ছিল ?"

"হ্যাঁ। গোড়ার দিকেই।"

"তুই কি লেখায় বিষের নাম দিয়েছিলি ?"

"হ্যাঁ।

"পুরো নামটা আমার নোট বইয়ে লেখা আছে। এক ধরনের শ্যাওলার মতন জিনিস। দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। সমুদ্রের কাছে সাধারণত। এখানে এ বিষ পাওয়া যাবে কেমন করে। একটা ইংরেজি বইতে ব্যাপারটা দেখেছিলাম। দেখে নোটখাতায় টুকে নিয়েছিলাম।"

"এই বিষে কাজ হয় ?"

"তার আমি কী জানি ! বইয়ে

দেখেছিলাম, টুকে নিয়েছিলাম। হাতেকলমে তো পরীক্ষা করে দেখিনি। তাছাড়া গল্পের বইয়ে লেখা বিষ নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় !"

পশুপতি মাথার চুল ঘাঁটতে লাগল। কী ভাবছিল কে জানে। সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, "তোর খানিকটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে জীবন। আমার মনে হয় না, তোর গল্পের বই থেকে কেউ খুন করার ব্যাপারটা শিখে নিয়েছে। এ-রকম কখনো শুনিনি। তাই যদি হত তবে শয়ে-শয়ে হাজারে-হাজারে গোয়েন্দা বই যা বেরোয় বাজারে—তার থেকে লোকে খুনখারাপি শিখে নিত। গল্পের গোরু গাছে ওঠে, সত্যিকারের গোরু কি আর গেছো হয় !"

পশুপতি যা বলছিল তা আমিও বুঝি। গোয়েন্দা বই পড়ে কেউ খুন শেখে না। কিন্তু এই ব্যাপারটায় এমন আশ্চর্য মিল ঘটে গেল বলেই আমার আতঙ্ক হচ্ছিল।

পশুপতি বলল, "শোন, কতকগুলো সহজ যুক্তি সাজিয়ে নে। প্রথম যুক্তি হল, মহিমবাবু আচমকা মারা গিয়েছেন এটা ঠিকই, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ কি বলেছে ওঁকে খুন করা হয়েছে ? হুট্ করে মানুষ মরতেই পারে। মহিমবাবুর হয়তো হার্টের রোগ ছিল, বা হয়েছিল, তিনি জানতেন না, আমরাও জানতাম না।"

"ডাক্তার ডেথ্ সার্টিফিকেট দেয়নি।"

"না দেওয়াই স্বাভাবিক। না জেনে কোন্ ডাক্তার সার্টিফিকেট দেয় !"

"পোস্ট মর্টেম হচ্ছে—শুনলি তো ?"

"অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে সেটা হয় বলেই শুনেছি। তুই একটা দিন অপেক্ষা কর না। কালকেই হয়তো জানতে পারবি। রিপোর্ট পেলেই সব শোনা যাবে।"

"অপেক্ষা তো করতেই হবে। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, পশুপতি। ভাল লাগছে না। দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"

"মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছিস ! যা ঘটেছে সেটা কাকতালীয়। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে

থাক।"

হয়তো পশুপতির কথাই ঠিক। যা ঘটেছে সেটা কাকতালীয়। এমনও হতে পারে, আমি যা ভাবছি ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। মহিমবাবু হার্টের রোগেই মারা গিয়েছেন। এ-রকম হামেশাই হয় আজকাল, অফিসে কাজ করতে করতে মানুষ মারা যায়, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে লুটিয়ে পড়ে, চায়ের কাপ মুখে তোলার অবসর পায় না, চিরকালের মতন চোখ বোজে। হ্যাঁ, এ-রকম হয়। তবু আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে কেন?

পশুপতি বলল, কথা ঘোরাবার জন্যেই, "তোর গল্পে কী ছিল রে?"

"গল্পে?"

"হ্যাঁ।"

"বললাম তো! একটা বুড়োকে তার ভাইপো খুন করবে।"

"একটু ছড়িয়ে বল। কেমন করে করবে, মানে কীভাবে?"

"বুড়োকে বিষ মেশানো সিগারেট দেবে খেতে। বুড়ো বুঝতে পারবে না। আসলে একটা প্ল্যান করা হয়েছিল বুড়োকে মারার জন্যে। বুড়ো সব ব্যাপারেই খুব সাবধানী ছিল, সন্দেহও করত এক ভাইপোকে। কিন্তু যখন সে খুন হয়—তার কিছু ভুল হয়েছিল।"

"কী ভুল হয়েছিল?"

"প্রথম ভুল, সে ধরতেই পারেনি—তার চশমাজোড়া যে ভেঙে ফেলল—মানে তার চাকর ভেঙে ফেলেছিল, সেটার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তার ভাইপো বুড়োর চাকরকে দিয়ে এটা করেছিল। চশমা না থাকায় বুড়ো বুঝতে পারেনি, কখন তার সিগারেটের প্যাকেট বদল করে অন্য প্যাকেট রাখা হয়েছে। তৃতীয় ভুল, বুড়ো হাড়কিপ্টে বলে বাড়ির বারান্দায় প্রায় অন্ধকারেই বসে ছিল। আলো জ্বালেনি। রাস্তার আলোতেই বসে বসে আরাম করছিল।"

পশুপতি বলল, "মহিমবাবুর চশমা কিন্তু কেউ ভাঙেনি।"

"হ্যাঁ। তবে মহিমবাবুর চোখের দোষ ছিল বড় রকমের। তিনি এক রকম রাতকানা ছিলেন।"

"তা অবশ্য ঠিক। তবে তাঁকে তো দোকানের কর্মচারীরাই সিগারেট কিনে এনে দিত। তারা সকলেই পুরনো কর্মচারী। বিশ্বস্ত।"

"বিশ্বস্ত লোক কি অবিশ্বাসের কাজ করে না?"

"টাকাপয়সা খেয়ে করতে পারে।"

"অনায়াসে পারে। তাছাড়া, মহিমবাবুর দোকানের কর্মচারীরা সবাই ধর্মপুত্তুর একথা কে বলল? আমরা তাদের কতটুকু জানি।"

পশুপতি অস্বীকার করল না।

বাস্তবিক পক্ষে আমরা মহিমবাবুর দোকানের খবর বেশি জানতাম না। তাঁর দোকানে মাঝে মাঝে গিয়েছি, চা খেয়েছি, কথাবার্তা বলেছি সামান্য। ভদ্রলোক যে খারাপ ছিলেন তা নয়, তবে সদালাপী ছিলেন না। বসে বসে গল্প করার মতন মানুষও নন। কাজের কাজটুকু সেরে তিনি আমাদের বিদায় জানাতেন।

মহিমবাবুর দোকানে চার-পাঁচজন কর্মচারী দেখেছি। মুখে সকলকেই চিনি। কারও নাম জানি, কারও শুধু পদবীটা। কর্মচারীদের মধ্যে গৌরাঙ্গবাবু সবচেয়ে পুরনো। তিনি বয়স্ক লোক। বিক্রিবাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন গৌরাঙ্গবাবু আর রায় বলে এক ছোকরা। অন্য দু'জনের মধ্যে ছিল কানু বলে এক লম্বা সিড়িঙে আধবয়েসী লোক, আর মল্লিক নামের এক জোয়ান ছেলে। মাঝে-সাঝে দাশু বলে একজনকে দেখেছি।

এদের কারও সঙ্গে আমাদের পরিচয় তেমন গভীর ছিল না। গৌরাঙ্গবাবু অবশ্য সজ্জন মানুষ।

আমি বললাম, "খারাপ না হলেই ভাল। তবু বলছি, নিধুর ব্যাপারটা আমার ভাল

লাগছে না। সে বেপাত্তা হবে কেন?"

"খোঁজ করবি?"

"ভাবছি।"

"বেশ, কর। আমি তোর সঙ্গে থাকব।"

॥ চার ॥

সকালের দিকেই পশুপতির ঝামেলা বেশি থাকে। বাজার-হাট, মুদিখানা, কয়লা-ঘুঁটে, কে এল কে গেল — টাকা পয়সার হিসেব আদায়পত্র, এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে বেলা পর্যন্ত।

আমার তর সইছে না দেখে পশুপতি বারো আনা কাজ দশটা নাগাদ মিটিয়ে দিয়ে বলল, "নে চল। আমি তৈরি।"

রাস্তায় বেরিয়ে পশুপতি বলল, "তোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে রাত্তিরে ঘুমোতে পারিসনি?"

সত্যিই রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। মাথার মধ্যে ওই একই চিন্তা জট পাকিয়ে গিয়েছিল! মহিমবাবুর মুখ বার বার মনে পড়েছে। বেচারি! পানুবাবু, প্রেস, নিধু,—প্রত্যেকের কথাই ভেবেছি কাল।

পানুবাবুর প্রেস বিবেকানন্দ রোডের দিকে। বড় রাস্তায় নয়, গলির মধ্যে।

আমরা দু'জনে হাঁটতে লাগলাম। কলেজ স্ট্রিটের মুখে এসে ট্রাম ধরব।

পশুপতি বলল, "তুই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিস যেন!"

"না।" মিথ্যে কথাই বললাম পশুপতিকে। আসলে আমায় ভয়ে ধরেছিল।

"তোর মুখ বলছে তুই ভয় পেয়েছিস," পশুপতি বলল, "তোর ভয়, পুলিশ তোকে ধরবে! বলবে, জীবনলালবাবু, আপনি মশাই মহিমবাবুকে খুন করার পথটা দেখিয়েছেন। আপনাকে ছাড়া হবে না। ...সত্যি তুই জীবন একটা গাধা। পুলিশের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোকে ধরতে আসবে।" পশুপতি হাসতে লাগল।

আমি বললাম, "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। পুলিশ যদি ছোঁয়—আমায় নাজেহাল করে ছাড়বে। আমি ভাই পুলিশকে ভয় পাই।"

"তাহলে আর ডিটেকটিভ বই লিখিস না। ভূতের গল্প লেখ।"

কথা বলতে বলতে আমরা মোড়ে এসে পড়েছিলাম। ট্রাম আসছিল।

রবিবার। প্রেস বন্ধ। আমরা ভেবেছিলাম, এখন কাজের চাপ চলছে—হয়তো খোলা থাকতে পারে। দরোয়ান রামলাল বলল, গত রবিবার কাজ হয়েছে। এ-রবিবার কেউ আর কাজ করতে চায়নি, তাই ছুটি।

পশুপতি বলল, "নিধুর ঠিকানাটা জেনে নে, জীবন!"

দরোয়ান আমাদের চেনে। আমাকে হামেশাই দেখে প্রেসে আসতে। "রামলাল, ওই নিধু কোথায় থাকে? ঠিকানা জানো?"

রামলাল একটু ভাবল। মাথা নাড়ল। বলল, "পাত্তা আমি জানি না, বাবু। মগর ও মেটিয়া কলিজের পাস থাকে।"

"গলির নাম?"

"মালুম নেহি।"

পশুপতি আমার দিকে তাকাল। বলল, "কাল পানুবাবুকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হত।"

"তখন আমার এত কথা মনেও আসেনি। ...তাছাড়া, এখনও পানুবাবুকে ব্যাপারটা না বলা ভাল। আগে থাকতে রটিয়ে লাভ কী! দেখা যাক—কী হয়!"

রামলাল নিজেই বলল, "আপলোগ দাশুবাবুসে পুছে লিন, দাশুবাবু জানেন।"

"কোথায় থাকেন দাশুবাবু!"

"নাগিচ, এহি গলিসে চলে যান। বাঁয়া মোড় লেবেন। সাত লম্বর।"

"আচ্ছা!"

আমরা আর দাঁড়ালাম না, দাশুবাবুর খোঁজে চললাম।

যেতে যেতে পশুপতি বলল, "তুই দাশুবাবুকে চিনিস!"

"হ্যাঁ, হেড কম্পোজিটার।"

"চল—দেখি।"

বাড়ি খুঁজে পেতে দেরি হল না,

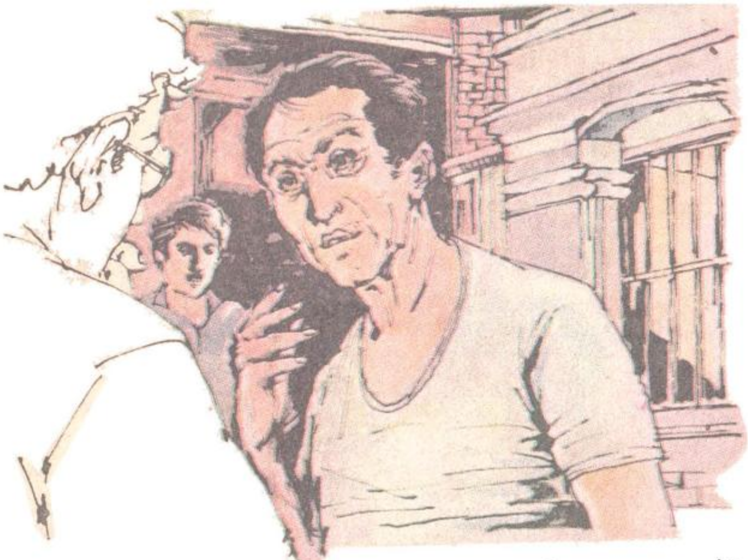

দাশুবাবুকে খুঁজে পেতেই দেরি হল। সেকেলে এক বৃহৎ বাড়ি, তারই খোপে খোপে অজস্র ভাড়াটে।

দাশুবাবু বললেন, "মেডিকেল কলেজের মেন গেটের উলটো দিকে যে গলিটা—ওই গলি দিয়ে ঢুকে যাবেন। শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। বাড়ির নম্বর মনে পড়ছে না। জানি না। বছরখানেক আগে একবার গিয়েছিলাম। একটা মুদির দোকান দেখবেন। জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে।" বলে দাশুবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিধুর নাকি কোন্ মাসি মারা গিয়েছে। খবর পাঠিয়েছিল। ওর মা-মাসি কেউ আছে বলে আমি জানি না। কামাই করার অজুহাত। ছেলেটা দিন দিন বদ হয়ে যাচ্ছে, জীবনবাবু। নেশাভাঙ করে বেড়ায় শুনেছি।"

আমি আসল কথাটা ভাঙলাম না। বললাম, "যাই, একবার খোঁজ করে দেখি গে। পানুবাবু কাল গিয়েছিলেন। বললেন, আমার প্রুফ আটকে পড়ে আছে। প্রুফ তো আমার কাছে নেই, নিধুর কাছে। সে যে কী করল, কাগজপত্র হারাল না বাড়িতেই ফেলে রেখেছে—একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।"

দাশুবাবু বললেন, "গিয়ে দেখুন কী করল প্রুফগুলোর! দায়িত্ব বলে কিছু নেই ওর। ওদের দিয়ে কাজ হয় না। কী বলব বলুন! বাবু ভালমানুষ। চাকরিটা তো খাবেন না। আশকারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে। ...মহিমবাবুর কথা শুনেছেন?"

"শুনেছি। পানুবাবুই বলেছেন।"

"নিয়তি। কপালে কার কী আছে কে জানে!"

আমরা আর দাঁড়ালাম না।

ফিরে এসে আবার ট্রাম ধরার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, পশুপতি বলল, "নিধু ছেলেটা কেমন রে? তুই তো বেশি দেখেছিস!"

"ছেলেটাকে তো খারাপ দেখিনি, তবে চেহারাটা কেমন চোয়াড়ের মতন হয়ে গেছে আজকাল।"

"নেশাটেশা করে বলল !"

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

ট্রাম এল। বেশ ফাঁকা।

আমরা পাশাপাশি বসলাম। ট্রাম চলতে শুরু করলে আমি বললাম, "তুই মহিমবাবুর ফ্যামিলির খবর রাখিস ?"

"না। ওপর ওপর যা শুনেছি।"

"আমি ভাবছি, মহিমবাবুকে খুন করলে কার কী লাভ হতে পারে : কার স্বার্থ ?"

পশুপতি বলল, "আমার কিন্তু একবারও মনে হচ্ছে না, এটা খুনের ব্যাপার। ভদ্রলোক হার্টের রোগেই মারা গেছেন।"

"তোর কথা সত্যি হলেই ভাল।" বলে আমি রাস্তার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখলাম, আমাদের মেসের বিজনদা, রিকশায় চেপে কোথায় যেন যাচ্ছেন। আজই আমার মেসে ফেরার কথা ছিল।

নিধুকে পাওয়া গেল না। সে নাকি সকালের দিকে বেরিয়ে গিয়েছে। কখন ফিরবে কেউ জানে না।

নিধু যে-বাড়িটায় থাকে তাকে বাড়ি বলা যায় না। দপ্তরিখানা বললেই ঠিক বলা হয়। ছোট ছোট দুখানা ঘর, সামান্য বারান্দা। কাগজ-ছাঁটাই মেশিন, রাজ্যের ছাঁট কাগজ, পেস্ট-বোর্ড, কাঠের ডেস্ক, দুর্গন্ধে ভরা লেই—আরও কত কী পড়ে আছে।

দুটো লোক কাজ করছিল। বলল, তারা কিছু জানে না।

মুদির দোকানের লোকটাকেই ধরতে হল আবার। বলল, "রাত আটটা নাগাদ আসুন। ওই সময় দেখা পেতে পারেন।"

"ও কি বাড়িতে থাকে ?"

"থাকে। তবে আজ ক'দিন দেখছি রাত করে ফেরে।"

"বাঁধাইখানাটা কার ?"

"মণ্ডলবাবুর।"

পশুপতি আমার হাত ধরে টানল। বলল, "চল এখন। পরে দেখা যাবে।"

॥ পাঁচ ॥

সকালটা বৃথা গেল। দুপুরটাও।

পশুপতি বলেছিল, চল, বিকেলে একবার মহিমবাবুর বাড়ি থেকে দেখা করে আসি।

আমি রাজি হইনি। কেমন একটা ভয় করছিল। ও-বাড়িতে গিয়ে কী দেখব, কী শুনব কে জানে ! যদি পোস্টমর্টেম হয়ে গিয়ে থাকে—তাহলে মন্দ খবরও তো শুনতে পারি। আমি বললাম, আগে নিধুকে ধরি, দেখি ব্যাপারটা কী, তারপর যাব।

বিকেল শেষ হল। আজকাল তাড়াতাড়ি বিকেল ফুরোচ্ছে। ছ'টা নাগাদ একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেল।

এক একসময় মনে হচ্ছিল, আমি পাগলামি করছি। মহিমবাবুর মারা যাবার সঙ্গে প্রেসের এক সাধারণ কর্মচারী নিধুর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি অকারণ এক অসম্ভবের সঙ্গে নিধুকে জড়াতে চাইছি।

আবার মনে হচ্ছিল, যতই অসম্ভব হোক—একবার নিধুর খোঁজ নিতে আপত্তি কোথায় ? নিধুর আচরণে সন্দেহ করার মতন বিশেষ কিছু নেই হয়তো, তবু দু' একটা জিনিস থেকে সামান্য সন্দেহ হয়। নিধু কেন ক'দিন প্রেসে যাচ্ছে না ? কেন সে মিথ্যে কথা বলে কামাই করছে ? আজ ক'দিন সকালের দিকে সে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন ? কী জন্যে রাত করে ফিরছে ? সে কবে থেকে নেশাভাঙ শিখল ?

খুঁটিয়ে ভাবলে সন্দেহটা বাড়ে বই কমে না। আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে, প্রেসের নিধুর সঙ্গে বইয়ের দোকানের মালিক মহিমবাবুর কোনো সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যায় না।

আটটা বাজার খানিক আগেই পশুপতি আর আমি বেরিয়ে পড়লাম।

পশুপতি বলল, "মহিমবাবুদের বাড়িতে একটা ফোন করলে হত। তুই নম্বর জানিস ?"

"না। আমি দোকানের নম্বর জানি।"

"টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পেয়ে যেতাম। ...ফিরে গিয়ে করব।"

আমরা হাঁটিতে হাঁটিতে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের কাছাকাছি পৌঁছলাম যখন, তখন আটটা বেজে গিয়েছে।

মুদির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। দপ্তরিখানার দরজাও।

আমি কড়া নাড়লাম।

কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভেতরে আলো জ্বলছে বোঝা যাচ্ছিল।

আবার কড়া নাড়তে ভেতর থেকে সাড়া এল। "কে?"

গলার স্বরটা নিধুর বলে মনে হল না।

পশুপতি নিচু গলায় বলল, "আমার নাম বল।"

কারও নাম বলতে হল না, দরজা খুলে গেল।

জায়গাটা অন্ধকার মতন, তবু যে দরজা খুলল—তাকে চিনতে পারলাম না। লোকটার বয়েস বেশি নয়। মনে হল, আমাদের বয়সী। লোকটা আমাদের দেখল। বলল, "কী চাই?", ওর গলার স্বর রুক্ষ।

"নিধু আছে?"

"কে? কে নিধু?"

পশুপতি আমার গায়ের পাশে গা দিয়ে দাঁড়াল। বলল, "এ-বাড়িতে নিধু বলে কেউ থাকে না?"

"না। আমি জানি না।"

"নিধু এ-বাড়িতেই থাকে। আমরা প্রেস থেকে ঠিকানা নিয়ে ও-বেলা দেখা করতে এসেছিলাম।"

"প্রেস! ...ও আপনারা নিমাইসাধনের কথা বলছেন! সে তো আজ ক'দিন হল দেশে চলে গিয়েছে।"

পশুপতি আমার দিকে তাকাল। আমি পশুপতিকে দেখলাম।

লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। ডাহা মিথ্যে।

পশুপতি বলল, "ক'দিন মানে ! সকালে এসে শুনলাম, নিধু ভোর-ভোর বেরিয়ে গেছে আর আপনি বলছেন সে নেই ?"

"হ্যাঁ, নেই। যান, ঝামেলা পাকাবেন না।"

"আপনি এ-বাড়িতে থাকেন ?"

"না।" লোকটা বিরক্ত হল। তার চেহারাটা ষণ্ডামার্কা। মাথা-ভর্তি চুল। গায়ে স্পোর্টস গেঞ্জি।

পশুপতি একসময় মারকুটে ছেলে ছিল। রাস্তাঘাটে চড়চাপড় ঘুষি চালাত। আজকাল তার ওসব দোষ নেই। লোকটার বেয়াড়াপনা, তাচ্ছিল্যের ভাব, মস্তানি দেখে পশুপতি ভেতরে ভেতরে চটছিল। সে যে চটছিল, আমি বুঝিনি। বুঝলাম—পশুপতি যখন দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে আচমকা দরজা ঠেলে নিজের শরীরের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দিল।

লোকটা এ-রকম আশা করেনি, থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

পশুপতি ভেতর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "নিধু, আমি আর জীবনবাবু তোমার কাছে এসেছি। দরকারি কথা আছে। তুমি যদি না বেরিয়ে এসে দেখা করো, আমরা কিন্তু সোজা থানায় যাব। মহিমবাবু মারা গেছেন।"

লোকটা আচমকা পশুপতিকে ধাক্কা মারল। পশুপতি সামলাতে পারল না। পড়ে গেল। আমি দরজার পাশে, তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পশুপতিকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েই লোকটা ছুটল। পালাল।

এত দ্রুত এবং সহসা সব কিছু ঘটে গেল যে, আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না, করতেও পারলাম না।

পশুপতি উঠে দাঁড়াল।

"লোকটা পালিয়ে গেল," আমি বললাম, "লেগেছে তোর ?"

"না। তুই বেটাকে ধরতে পারলি না ?"

"বুঝতেই পারিনি।"

"যাক গে।" পশুপতি ছোট্ট উঠোনটুকু পেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "দরজা বন্ধ

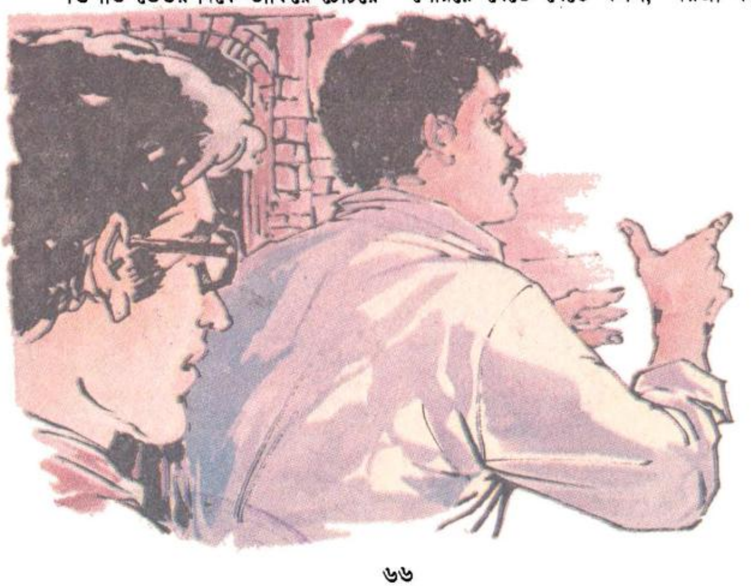

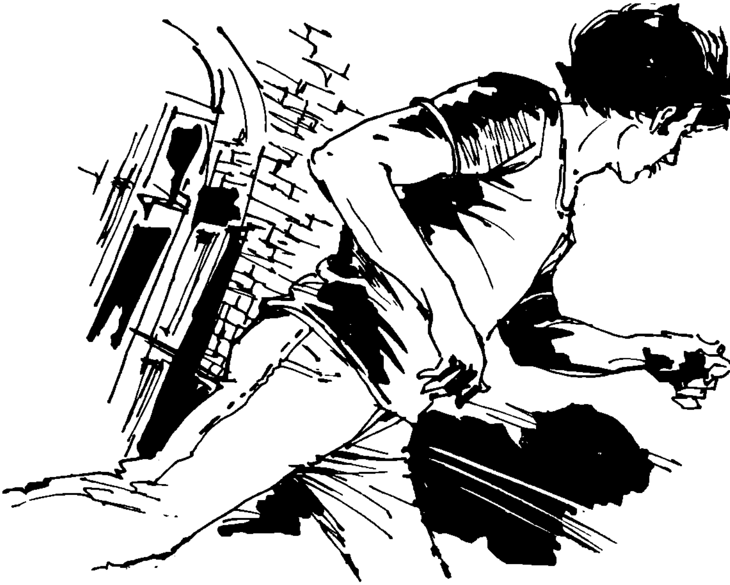

করে দে। ভেতরে আয়।"

দরজা বন্ধ। দপ্তরিখানার মেশিনপত্র যেমন ছিল পড়ে আছে বারান্দায়। সকালের তুলনায় সামান্য সাফসুফ।

পশুপতি আবার ডাকল, "নিধু, বাইরে এসো।"

কোনো সাড়া নেই।

দুটো ঘরের একটা বন্ধ ছিল বাইরে থেকে, অন্যটা ভেতর থেকে। দুটো ঘরই অন্ধকার।

এবার আমি নিধুকে ডাকলাম। ধাক্কা দিলাম দরজায়। তবু কোনো সাড়াশব্দ দিল না নিধু।

শেষে পশুপতি বলল, "তোমাকে এই শেষবার বলছি নিধু। বাইরে এসো। যদি না বেরিয়ে আসো, আমরা কিন্তু এবার সোজা থানায় যাব। তুমি ভেবো না, আমরা দু'জনেই একসঙ্গে থানায় যাব। আমি এখানে তোমাকে আটকাব। জীবনবাবু থানায় যাবেন।"

আমরা সামান্য অপেক্ষা করতেই ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ এল। তারপর নিধু বেরিয়ে এল। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল তার চেহারা, পোশাক সবই যেন কেমন নোংরা বিশ্রী দেখাচ্ছে।

নিধু বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। কথা বলল না।

পশুপতি বলল, "তুমি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলে কেন? আমরা ডাকছি, শুনতে পাচ্ছিলে না?"

কোনো জবাব দিল না নিধু।

আমি বললাম, "তোমার কাছে আমরা কেন এসেছি জানো?"

মাথা নাড়ল নিধু। জানে না।

"মিথ্যে বোলো না, তুমি জানো?"

"না বাবু।"

"তুমি আবার মিথ্যে কথা বলছ। তুমি জানো, মহিমবাবু মারা গেছেন?"

"শুনেছি।"

"কে বলেছে?"

"ফ্লুবাবু।"
"ফ্লুবাবু কে ?"
"ওই যে পালিয়ে গেলেন।"
"ও কে ? কী করে ? কোথায় থাকে ?"
নিধুর যে ভয় ধরে গিয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। নিধু বলল, "ফ্লুবাবু এই দপ্তরিখানার মালিকের বন্ধু। মালিক হলেন মণ্ডলবাবু। এই দপ্তরিখানায় মহিমবাবুর দোকানের তিন-চারটে বই বাঁধাই হয়। আমি এখানে থাকি। মণ্ডলবাবু আমায় থাকতে দিয়েছেন। রাতে দপ্তরিখানা পাহারা দিই।"
"ফ্লুবাবু কী করে ?"
"জানি না বাবু, শুনেছি ফ্লুবাবু ট্যাক্সি কিনেছে। ...ফ্লুবাবু মাঝেমাঝেই এখানে আসেন। মণ্ডলবাবুর সঙ্গে গল্পগুজব করেন।"
পশুপতি বলল, "ও ! ...তা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি কাজ করো পানুবাবুর প্রেসে। ফ্লুবাবু ট্যাক্সির মালিক। তোমাদের মধ্যে বইয়ের দোকানের মালিক মহিমবাবুকে নিয়ে কথা হবে কেন হে ? ও কেন তোমাকে মহিমবাবুর মারা যাবার খবর শোনাবে ?"
নিধু চুপ। জবাব দিতে পারছিল না।
আমি হঠাৎ বললাম, "নিধু, তুমি কথা লুকোচ্ছ। সত্যি করে সব কথা বলো। নয়তো তোমার বিপদ হবে।"
নিধু প্রথমে চুপচাপ। তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বাবু, ফ্লুবাবু মহিমবাবুর নিজের লোক। বড় বোনের ছেলে। ভাগ্নে। ফ্লুবাবু আগে তাঁর মামার দোকানে বসতেন। দোকানের টাকা পয়সা চুরি করার জন্যে মামা ফ্লুবাবুকে একদিন নাকি জুতোপেটা করে দোকান থেকে বার করে দেন। সেই থেকে ফ্লুবাবু মামার ওপর খাপ্পা।"
পশুপতি আমার দিকে তাকাল। বলল, "ব্যাপারটা একটু ধরা যাচ্ছে যেন রে ! কিন্তু মহিমবাবুর ভাইপো ভাগ্নে শুনেছি বেশ কয়েকজন। মামা মরলে ফ্লুর লাভ কী ?"
কী লাভ তা আমিও জানি না। মামার অবর্তমানে কী পাবে ফ্লু ?
আমি নিধুকে বললাম, "ফ্লুবাবুর কথা থাক। এবার তুমি অন্য কথার জবাব দাও।" বলে আমি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকটা দেখলাম। "তুমি ক'দিন কাজে কামাই করছ কেন ?"
নিধু জবাব না দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।
"তুমি নাকি বলে পাঠিয়েছ, তোমার মাসি মারা গেছে। দাশুবাবু বললেন, তোমার মা-মাসির কথা উনি শোনেননি। তুমি মিথ্যে কথা বলেছ।"
নিধুর আবার কান্না এসে গেল। বলল, "হ্যাঁ বাবু।"
"কেন ?"
"ফ্লুবাবু আমাকে দিয়ে একটা কাজ করাচ্ছিলেন !"
"কী কাজ !"
"আমাকে তিনি একটা চাবি দিয়ে দিতেন। আর বলতেন রাজাবাজারে অমুক জায়গায় যাবে, খিদিরপুরে তমুক জায়গায় যাবে। আমি রোজ ফ্লুবাবুর কথামতন রাজাবাজার, খিদিরপুর, ট্যাংরা, চেতলা, যাদবপুর যেতাম। উনি আমায় পঞ্চাশটা করে টাকা দিতেন।"
পশুপতি বলল, "চাবি দিতেন কেন ? তুমি কাদের কাছে যেতে ?"
"যাদের কাছে যেতাম বাবু, তারা ভাল লোক নয়। তারা খারাপ খারাপ নেশা বিক্রি করে লুকিয়ে। অচেনা লোককে তারা কিছু দেয় না, কথাও বলে না। চাবি দেখলে তারা বুঝতে পারত, কোনো চেনা খদ্দের লোক পাঠিয়েছে। তবু তারা সন্দেহ করত। ঘোরাত।"
"তুমি কি কোনো বিষ এনেছিলে ? না, ফ্লুবাবুর নেশা আনতে ?"
নিধু চুপ। তারপর ডুকরে উঠল। বলল, "আমায় কেউ কিছু দিত না। সন্দেহ

করত। একটা লোক শুধু হোমিওপ্যাথির ছোট্ট শিশিতে কী একটা জিনিস দিয়েছিল। বলেছিল সাবধানে রাখতে। প্রথম দিন দেয়নি। বলেছিল, দুশো টাকা নিয়ে যেতে। ফুলুবাবু টাকা দিলে আমি পরের দিন গিয়ে নিয়ে এসেছিলাম।"

"সেটা কী?"

"জানি না, বাবু।"

"কেমন দেখতে?"

"কালচে মতন। গুঁড়ো।"

"ফুলুবাবু সেটা নিয়ে কী করেছিল?"

"আমি জানি না।"

"তুমি কবে ওটা এনেছিলে?"

"শুক্কুরবার দুপুরে।"

"ফুলুবাবুকে কখন দিলে?"

"ফুলুবাবু কলেজ স্ট্রিটে বাজারের ভেতর চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। আমায় বলে দিয়েছিলেন যেতে। আমি গিয়ে তাঁকে জিনিসটা দিয়ে দিই।"

"তারপর?"

"আমি আর কিছু জানি না বাবু।"

"তুমি কাল কেন প্রেসে যাওনি?"

"ফুলুবাবু আমায় যেতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি এখন প্রেসে যাবে না। দপ্তরিখানাতেও দিনের বেলায় থাকবে না। তোমায় অন্য একটা ভাল কাজ যোগাড় করে দেব।"

পশুপতি আমার গা টিপল।

আমি বললাম, "নিধু, তুমি আমার দেখা প্রুফ আর তার সঙ্গে যে কপি ছিল তা প্রেসে ফেরত দাওনি। কেন?"

"আমি তো প্রেসে যাইনি, বাবু।"

"সেগুলো কোথায়?"

"আমার কাছেই আছে?"

"ওগুলো কেউ দেখেছিল? পড়েছিল?"

"না, না বাবু," মাথা নাড়ল নিধু। "আমি যেভাবে এনেছিলাম সেইভাবেই রেখে দিয়েছি। বাণ্ডিলটা এখনও ঘরে পড়ে আছে।"

পশুপতি আর আমি একই সঙ্গে বললাম, "তুমি ঠিক বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ...আপনারা ঘরে আসুন—আমি দেখাচ্ছি।"

নিধু আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকল। বাতি জ্বেলে দিল। চতুর্দিকে বাঁধাইখানার নোংরা। তারই মধ্যে থাকে নিধু। একটা কুলুঙ্গির মধ্যে থেকে সত্যিই নিধু প্রুফের বাণ্ডিল বার করে দিল।

আমি একবার দেখলাম।

তাহলে?

পশুপতিও ভাবছিল, তাহলে?

আমি আবার বললাম, "নিধু, তুমি ঠিক জানো, এই প্রুফ কেউ পড়েনি?"

"হ্যাঁ বাবু, কেউ পড়েনি।"

"তা হলে মহিমবাবুকে কেমন করে মারা হল?"

নিধু চুপ করে থাকল। আমরাও ভেবে পাচ্ছিলাম না ব্যাপারটা কী হল?

নিধুই হঠাৎ বলল, "বাবু, আমি একটা কথা শুনেছি। আমার কানে গিয়েছিল। মহিমবাবু বাড়ি ফেরার আগে জল আর এক কাপ পাতলা চা খেতেন। জল দোকানেই থাকত। চা আসত দোকান থেকে। কী যেন নাম দোকানটার। ফুলুবাবুর ওই দোকানে আসা-যাওয়া ছিল। চায়ের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিলেন কি না ফুলুবাবু বলতে পারব না।"

আমরা যেন চমকে উঠলাম। মনে হল, এটা হতে পারে। একেবারেই অসম্ভব নয়। মহিমবাবু বিষ-মেশানো চা খেয়েই রিকশায় উঠেছিলেন। হয়তো দশ-বিশ মিনিট সময় গিয়েছে বিষের ক্রিয়া হতে। তারপর তিনি জানতেও পারেননি কেমনভাবে মৃত্যু এসে তাঁকে এ-জীবনের মতন ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেল।

আমি বললাম, "পশুপতি! নিধুই ঠিক বলেছে বোধ হয়।"

পশুপতি মাথা নাড়ল।

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে

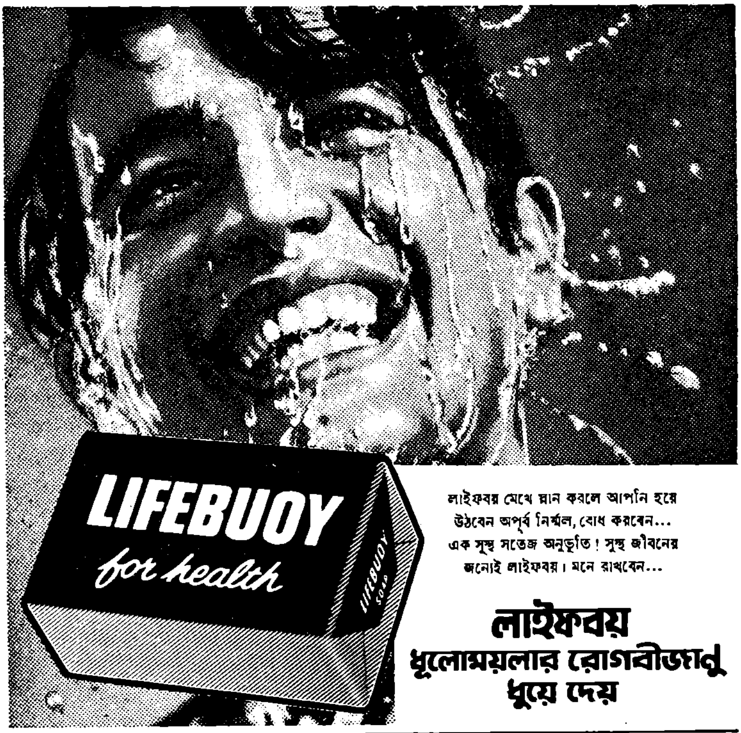

লাইফবয় মেখে স্নান করলে আপনি হয়ে উঠবেন অপূর্ব নির্মল, বোধ করবেন... এক সুস্থ সতেজ অনুভূতি! সুস্থ জীবনের জন্যেই লাইফবয়। মনে রাখবেন...

লাইফবয়
ধূলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

আর পাওয়া যায় **লাইফবয় পার্সোনাল**

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্যে

LINTAS/LP/23/203 BG

॥ ৫৭ ॥

বাঘা সোম সাধারণ কোচ ছিলেন না। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে, ফুটবল মরসুম শুরু হওয়ার আগে তিনি নতুন-নতুন ছেলেদের ট্রেনিং দিতেন। এর ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে ভাল ফুটবলার পাওয়াও যেত।

এইভাবেই একদিন কাজল মুখার্জির আবির্ভাব ঘটেছিল। বলের ওপর কাজলের নিয়ন্ত্রণ ছিল দেখার মতো। এমন সৌন্দর্যময় খেলা সচরাচর দেখা যায় না। কাজলের প্রধান দোষ ছিল, অতিরিক্ত সময় পায়ে বল রাখা। যে-কোনো বড় প্লেয়ারের ক্ষেত্রেই হয়তো কথাটা কিছু পরিমাণে প্রযোজ্য। আর দুর্বলতা ছিল শ্যুটিংয়ে। কাজলের পায়ে প্রচণ্ড শট ছিল, কিন্তু শট নেবার সময়টা ঠিক ছিল না। ভাল গোলগেটারকে জানতে হয়, কখন শট নিলে গোলকিপারকে অপ্রস্তুত করে গোল পাওয়া যাবে। ঠিক জায়গায় পৌঁছলেই হয় না, জায়গা করে নিয়ে সময়মতো শট নিতে হয়। এই সময়জ্ঞানের সুবাদেই পেলে-ইউসেবিও-পুসকাস এত গোল করতে পেরেছেন।

কাজল মুখার্জিও বড় টিমে চলে গিয়েছিলেন। ভবানী রায় আর কালন গুহর মতো। আরও অনেক ফুটবলার বাঘাদার হাতে তৈরি হয়ে বড় টিমে জায়গা করে নিয়েছেন। মিরকাশিমও খুব ভাল ফুটবলার ছিলেন। এই তরুণ ফুটবলারটির খেলায় ছিল ভারতীয় ফুটবলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য। মিরকাশিমের ড্রিবলিং যেন এখনও আমার চোখে ভাসে।

পঁয়ষট্টিতে আমরা লিগে ভালই খেলছিলাম। লিগের মাঝপথে এসে দেখা গেল আমরা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের সামান্য নীচেই রয়েছি। আমি মোটামুটি ভালই গোল পাচ্ছিলাম। ছোট্ট বন্ধুরা, আবার বলি, আমি কলকাতা লিগে প্রতি বছরই বেশ কিছু গোল করলেও একবারও টপস্কোরার হতে পারিনি। যদিও ভারতের হয়ে অধিকাংশ টুর্নামেন্টেই সবচেয়ে বেশি গোল করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

লিগে অবশ্য শেষরক্ষা করা গেল না। আমার গোড়ালিতে আবার চোট লাগল। আমরা কিছুটা পিছিয়ে পড়লাম।

তখন লিগে সত্যিই জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান ছাড়াও দারুণভাবে লড়াইয়ে থাকত এরিয়ান, রাজস্থান, ইস্টার্ন রেল আর বি এন আর। সেই জমজমাট লিগের ছবিটা এখন আর তোমরা কল্পনাতেও আনতে পারবে না। পরের চারটি দলের সঙ্গে খেলার আগে বড় তিনটি টিমকে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় থাকতে হত। লিগের ফয়সালা তখন দু-তিনটে তথাকথিত বড় ম্যাচে হয়ে যেত না।

ইস্টার্ন রেল টিমে তখন কিছু ফুটবলার খেলে গেছেন, যাঁদের নিঃসন্দেহে বড় ক্লাবে খেলার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু, রেলের চাকরির মায়ায় অথবা টিমকে ভালবেসে অথবা বাঘাদার প্রতি ভয়ে-ভক্তিতে তাঁরা ইস্টার্ন রেল টিমে খেলেই নিঃশেষ হয়ে গেছেন। এমনই একজন ফুটবলারের নাম

দিনু দাস, যাঁর কথা আগেও তোমাদের অনেকবার বলেছি।

নতুনদের মধ্যে এলেন সুধীর ধর, অনিল মুখার্জি। এঁরা যে কত ভাল ফুটবল খেলতেন বলে বোঝাতে পারব না।

পঁয়ষট্টিতে আই এফ এ লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে আমরা হায়দ্রাবাদ পুলিশের কাছে হেরে গেলাম ১—৩ গোলে। বাইরের টিমের বিরুদ্ধে আমাদের ভাল খেলার সুনাম ছিল। ১৯৫৭ সালে আমরা এই হায়দ্রাবাদ পুলিশকে নাস্তানাবুদ করে হারিয়েছিলাম ৪—৩ গোলে। পঁয়ষট্টিতে পারলাম না। তিন গোল হজম করার পর আমার সেন্টারে হেড নিয়ে একটা চমৎকার গোল করেছিলেন তাপস বসু। কিন্তু তখন আর ফাইট-ব্যাকের সময় ছিল না।

তোমাদের এখন ১৯৬৫-র কাহিনী শোনাচ্ছি। কিন্তু, একবার একটি বছর পিছিয়ে যেতেই হচ্ছে। ১৯৬৪-তে সোভিয়েত রাশিয়ার একটি ফুটবল দল ভারত সফরে এসেছিল। রবীন্দ্র সরোবরে প্রথম ম্যাচে সর্বভারতীয় দল এক গোলে হারল। আমার খেলা নিজেরই পছন্দ হল না।

খড়গপুরে সর্বভারতীয় রেল দলকেও রুশ দল হারাল ২—১ গোলে। একটা দুর্ধর্ষ গোল করলেন আমাদের সেন্টার ফরোয়ার্ড আপ্পালারাজু। রুশ গোলকিপার নড়ার সময় পাননি। দৌড়ের মুখে পঁয়ত্রিশ গজ দূর থেকে নেওয়া আপ্পালার দুর্দান্ত শট গোলকিপারের হাতে লেগে বারের নীচে লেগে গোলে ঢোকে। এই আপ্পালারাজুর দু'পায়েই ছিল ভয়ংকর শট।

মারদেকায় টুর্নামেন্ট চলাকালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুর রহমান (বাঁ দিক থেকে তৃতীয়), ভারতের জিয়াউদ্দিন (চতুর্থ)। পিছনের দুই সারিতে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা

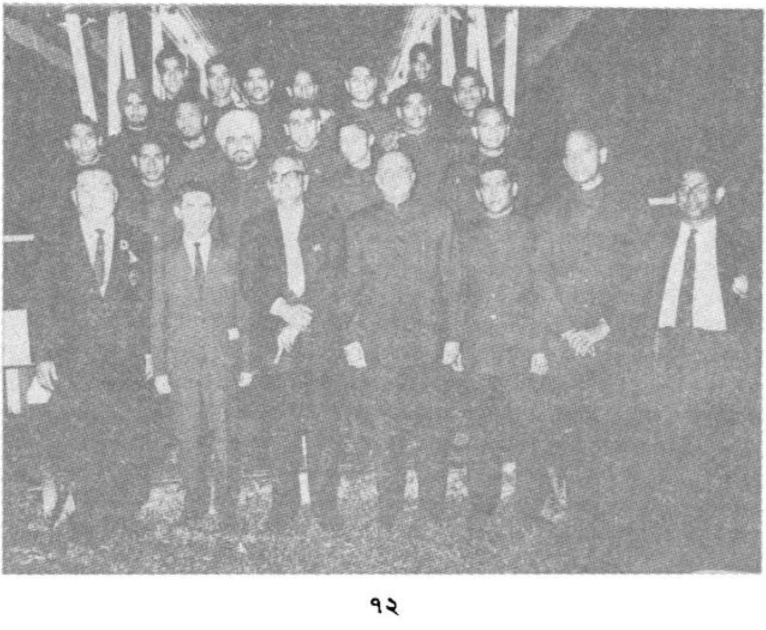

মারদেকায় বিশেষ অতিথির সঙ্গে করমর্দনে ইন্দার। বাঁয়ে প্রশান্ত, ডাইনে পি· কে, চুনী

সর্বভারতীয় দলের সঙ্গে রুশ দলের দ্বিতীয় খেলা হয় মাদ্রাজে। আক্ষেপ ছিল, আগের ম্যাচে ওদের বিরুদ্ধে গোল করতে পারিনি। এই ম্যাচে গোল পেলাম। রাইট ইনসাইডের জায়গা থেকে বুকে বল নামিয়ে বাঁ পায়ের ভলিতে গোল, বল ঢুকেছিল ফার্স্ট পোস্টের পাশ দিয়ে।

বোম্বাইয়ে তৃতীয় ম্যাচে মাঝমাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে গোল করলাম। কিন্তু হায়, কেন জানি না, রুশ ফুটবলারদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সেই গোল নাকচ করেছিলেন রেফারি। এমন কাণ্ড এখন হলে, নিশ্চয় কেউ চুপ করে থাকত না। দ্বিতীয়ার্ধে উঠতি ফুটবলার অশোক চ্যাটার্জিকে সুযোগ দেওয়ার জন্য বসে গেলাম। দারুণ খেলল অশোক। দুর্ভাগ্য, গোল পেল না।

ঐটুকু চেহারা অশোকের, কিন্তু কী দুঃসাহসিক খেলা যে খেলত, ভাবতে পারবে না। এখনকার ফুটবলারদের মধ্যে এক হাবিব ছাড়া আর কাউকেই এত ঝুঁকি নিতে দেখিনি। অদ্ভুত ফিটনেস ছিল অশোকের, শরীর ছিল নমনীয়, চালচলনে ক্ষিপ্রতা ছিল অসাধারণ। শুনেছি, ছোটবেলায় পাড়ার সার্কাসের দলে নাকি জিমন্যাসটিকস দেখাত। সত্যি, ওর শরীর ছিল রবারের বলের মতো। আর, আগেই বলেছি, ছিল দুর্দমনীয় সাহস। এমন-এমন গোল করে গেছেন, যার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন।

আবার, ১৯৬৫-তে ফিরে আসি। আবার মারদেকা। ট্রেনিং শুরু হল বোম্বাইয়ে। আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল একটা নোংরা মুসাফিরখানায়। শুতে হত মাটিতে চাদর বিছিয়ে। অতিরিক্ত ঝাল-দেওয়া শস্তা খাবার আসত জঘন্য হোটেল থেকে। স্নানের ব্যবস্থাও খুব

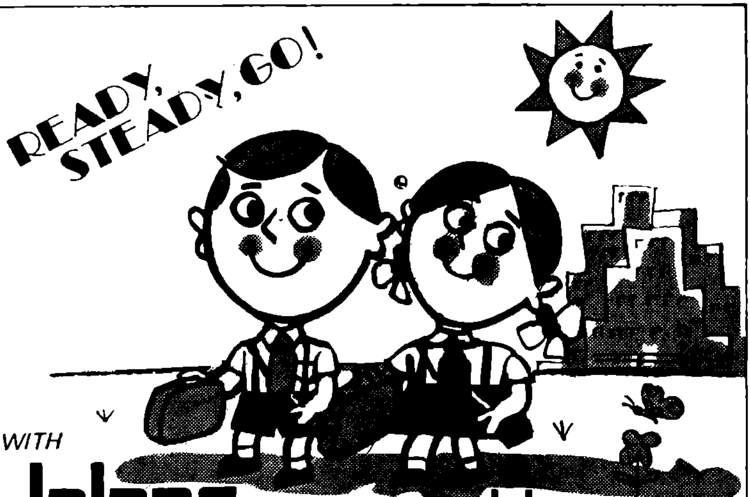

WITH

Jalans SCHOOL BAG

Jalans Creation for modern needs.

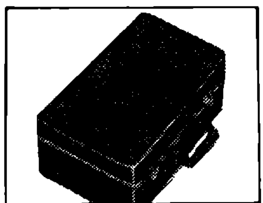

* It is for you, light as you wanted it to be, but roomy enough for all your books, tiffin box, pencil box and even comics.

Created in colours of Cherry Navy blue, Green..........to match your School Uniform and likes. Carry it anywhere you want after school to swim, picnics or even a short holiday.

like it ? Now get your folks to present you one on your birthday.

* INDIA'S First Moulded School Bag made for you by—

SHREE LAXMI ENTERPRISES

2, LALBAZAR STREET, CALCUTTA-700 001

খারাপ ছিল। আমরা সকলেই ক্ষুব্ধ ছিলাম। সকলের হয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানালেন চুনী গোস্বামী। কর্মকর্তারা তখন এসব প্রতিবাদ শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না। সব ব্যবস্থা যিনি করেছিলেন, সেই জিয়াউদ্দিনসাহেব একই সঙ্গে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলেন।

পঁয়ষট্টির মারদেকায় আমরা সেমিফাইনালে হেরে গিয়ে যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান পেয়েছিলাম বার্মার সঙ্গে। সাত-দশ দিনের প্র্যাকটিস, তবু আমরা বেশ ভালই খেললাম।

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে খেলায় একটা মজার ঘটনা ঘটল। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আমাদের খেলা মানেই তখন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। ওদের প্রচণ্ড আক্রমণ রুখে দিচ্ছিলেন অরুণ ঘোষ, জার্নেল সিং, ফ্রাঙ্কো আর প্রশান্ত সিংহ। জার্নেলকে তখন এশিয়ার সব দেশের ফুটবলাররাই ভয় করে চলতেন। সেদিনও সুবিধা করতে না পেরে কোরিয়ার কয়েকজন খেলোয়াড় জটলার মধ্যে জার্নেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখা গেল, জার্নেলের মুখ ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। ক্রুদ্ধ শিখের চেহারাটা যদি তোমরা দেখতে। উঠে দাঁড়িয়ে অরুণকে জিজ্ঞেস করলেন, "অরুণ, কৌন মারা ?" ঠিক কে মেরেছে, আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। তবে, ওদের লেফ্‌ট উইঙ্গার দারুণ খেলে আমাদের ডিফেন্সকে খুব বেগ দিচ্ছিলেন। অরুণ গম্ভীর মুখে তাঁকেই দেখিয়ে দিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লেফ্‌ট উইঙ্গার বল নিয়ে ছুটে এল, সামনে অরুণ ঘোষ। পিছন থেকে জার্নেল ছুটে আসতে আসতে বললেন, "অরুণ তু ছোড় দে।" তারপর একটি ভয়ংকর ট্যাকল। সেই লেফ্‌ট উইঙ্গারকে মাঠের বাইরে তো চলে যেতে হলই, তাঁর জ্ঞান ফিরল বেশ কয়েক মিনিট পরে! (ক্রমশ)

মৌচাক-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার

মৌচাকের মধু

রঙচঙে দর্শনদার দুই মলাটের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের মৌচাক-এর (১৩২৭—১৩৭৬) বাছাই-করা সব লেখা সযত্নে সাজিয়ে দিয়েছেন পত্রিকাটির প্রকাশক-সম্পাদক। এই সংকলনের নাম 'জয়ন্তী মৌচাক'। রূপে-গুণে চমৎকার।

ছেলেবেলায় ফেলে-আসা গ্রামটির প্রতি মানুষের যেমন টান থাকে তেমনি মৌচাক-এর উপর অনেকের টান রয়েছে। সদ্যপ্রকাশিত 'জয়ন্তী মৌচাক খানায় তাঁরা নিজেদের শৈশব ফিরে পাবেন।

আছে দারুণ-দারুণ সব লেখা—ছড়া কবিতা গল্প ভ্রমণকাহিনী প্রবন্ধ। প্রবন্ধ বলতে কিন্তু খটমট লেখা নয়, সহজ সরল মজাদার করে লেখা নানান জানবার কথা। তাছাড়া আছে নববর্ষ পর্যায়ের বেশ কিছু হিরের-টুকরো রচনা। ছোটদের প্রিয় লেখকদের যেসব লেখা তখন শিশুসাহিত্যে সাড়া জাগিয়েছিল সেইসব লেখাই আলো করে বসে আছে এতে। ১৩৭৬ সালের পরের লেখা কিন্তু নেই। তবে ভূমিকায় সম্পাদক একটা আগাম সুখবর দিয়েছেন, মৌচাকের এখন ৬৩ চলছে, পঁচাত্তরে পা দিলেই হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে সে নাকি একবার হিরের সাজে সাজবে।

রঞ্জন ভাদুড়ী

শিশিরকুমার বসু

(৭১)

সুইটজারল্যাণ্ড থেকে আমাদের চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে যাবার কথা। তিরিশের দশকে রাঙাকাকাবাবু কয়েকবার চেকোস্লোভাকিয়া গিয়েছেন। কার্লসবাদে চিকিৎসার জন্য থেকেছেন। তাছাড়া ঐ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর বেশ অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। সেই সময়কার চেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতি বেনেশের সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকবার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। ১৯৩৪-এ প্রাগে ভারত-চেক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে রাঙাকাকাবাবু ছিলেন অন্যতম। প্রাগের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ভারতপ্রেমিক অধ্যাপক লেসনি তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। খবর পাওয়া গেল যে, অধ্যাপক লেসনি ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরপদে এখনও আছেন। বাবা তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

জুরিখ থেকে এরোপ্লেনে আমরা প্রাগ পৌঁছলাম। প্রাগ এয়ারপোর্টে আমাদের পাশপোর্ট পরীক্ষা ও জিনিসপত্র তল্লাসি করতে গিয়ে সেখানকার পুলিশ দিশেহারা হয়ে পড়ল। আমাদের অনেকক্ষণ আটকেও রাখল। তিন মহিলার বাক্সে এতগুলো শাড়ি দেখে তারা কেবলই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল এবং বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, এত লম্বা লম্বা কাপড় এনেছেন কেন, এগুলো দিয়ে কী হবে ?

প্রাগের একটি পুরনো কিন্তু ভাল হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা ছিল। শহরে ঢুকে পথে চোখে পড়ল এখানে-ওখানে বিশাল বিশাল ছবি আর লাল পতাকা ও ফেস্টুনের ছড়াছড়ি। ঐ বছরেরই গোড়ার দিকে কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। সেজন্য পার্টির প্রধানের মুখ বড় বড় করে স্লোগান সমেত জনসাধারণকে দেখানো হচ্ছে। ইতালি ও সুইটজারল্যানডের পর খাওয়া-দাওয়ার দৈন্য ও অব্যবস্থা দেখে আমরা দমে গেলাম। তাছাড়া সাধারণভাবে আমরা লক্ষ করলাম যে, লোকজন বড় একটা হাসে না এবং কথাবার্তাও বেশি বলতে চায় না। এমনিতেই কনকনে ঠাণ্ডা। তার উপর লোকজনের, এমনকী হোটেলের কর্মীদেরও ঠাণ্ডা ব্যবহার! ‘সাইট-সিয়িং’ করতে গিয়েও নজর করলাম, সরকারি গাইডরাও যেন কেমন নিরুৎসাহ, দায়সারা মতন করে নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছে। ইতালির গাইডরা ছিল প্রাণোচ্ছল। ঐতিহাসিক সব জায়গা দেখাতে তাদের কী উৎসাহ, তাদের কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে দর্শকেরা মুগ্ধ।

তিরিশের দশকে রাঙাকাকাবাবু যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় ছিলেন তখন সব দিক দিয়েই তিনি বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথমত, ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধে ঐ দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহানুভূতি ; দ্বিতীয়ত, ও দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা ; তৃতীয়ত, শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে চেকদের কৃতিত্ব ; চতুর্থত, মানুষের সেবায় ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য প্রকৃতিকে কাজে

লাগানোর সার্থক প্রচেষ্টা—যেমন কার্লসবাদে চিকিৎসা করাতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাঙাকাকাবাবু বেশি কাউকে না জানিয়ে প্রাগে গিয়েছিলেন। নাম্বিয়ারকে তিনি বলেছিলেন, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের চেহারা তো তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। নাৎসিরা অধিকৃত দেশে কী ধরনের আচরণ করে তিনি নিজের চোখে দেখতে চান। দেখে তিনি গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন পরদেশগ্রাসী শাসকদের চেহারা একই। চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মান অধিকর্তা আমাদের দেশের ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভেরই প্রতিরূপ।

যাই হোক, আগে থেকে যোগাযোগ করে বাবার সঙ্গে আমরা এক সকালে প্রাগের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে উপস্থিত হলাম। প্রোফেসর লেসনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শ্রদ্ধা করবার মতো প্রবীণ, বিদ্বান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভদ্রলোক। বহু বছর আগে শান্তিনিকেতনে তিনি বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ও বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে জ্ঞানী-গুণী যেসব ব্যক্তিকে শান্তিনিকেতনে ডেকে এনেছিলেন জ্ঞান ও কৃষ্টির এক বিশ্বমেলা বা বিশ্বভারতী স্থাপনের জন্য, লেসনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র আমাদের দেশ সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। এমনকী মহেঞ্জোদারোয় নতুন কী কী আবিষ্কৃত হল, প্রাচীন লিপির মানে খুঁজে পাওয়া গেছে কিনা—তিনি জানতে চাইলেন। বাবা সব প্রশ্নের জবাব খুঁজেও পাচ্ছিলেন না। তবে প্রোফেসর লেসনিকে আশ্বাস দিলেন যে, দেশে ফেরার পর তাঁকে বিস্তৃতভাবে সব জানাবেন।

লেসনির কথাবার্তা থেকে বেশ বোঝা

বিভাবতী ও এমিলিয়ে (ভিয়েনা, ১৯৪৮)

সুভাষচন্দ্র ও অধ্যাপক লেসনি (প্রাগ, ১৯৩৪)

গ্লাইডারে আকাশে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে শরৎচন্দ্র বসু।

গেল রাঙাকাকাবাবুকে কী স্নেহের চোখে তিনি দেখতেন। এর একটা বিশেষ কারণও খুঁজে পাওয়া গেল। চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করার পর জার্মানরা অধ্যাপক লেসনিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর পরিবারের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁকে কোনো উপায়ে মুক্ত করতে না পারলে তিনি বাঁচবেন না। সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে আছেন খবর পেয়ে লেসনি-পরিবার তাঁর কাছে চিঠি দিলেন। তিনি জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ-বিষয়ে যেন কথাবার্তা বলেন। চিঠি পাঠাবার কিছুদিন পরেই প্রোফেসর লেসনি মুক্তি পান। তাঁর পরিবারের লোকেরা আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একথা স্মরণ করেন।

হোটেলে এক সন্ধ্যায় আমরা খেতে যাবার তোড়জোড় করছি। এক ভারতীয় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বাবাকে বললেন, তিনি সাংবাদিক, ১৯৪৬-এ তাঁর তাইওয়ান দ্বীপে যাবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি সেখানে রাঙাকাকাবাবু সম্বন্ধে যা-কিছু জানতে পেরেছেন বাবাকে জানাতে চান। আরও বললেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে তিনি তাঁর রিপোর্ট পেশ করেছেন। সর্দারজি তাঁকে বলেছেন সুযোগ পেলেই তিনি যেন বাবাকে সব কথা জানান। নাম হারীন শাহ। বাবা তাঁকে ডিনারের পর তাঁর ঘরে আসতে বললেন। আমাকে বললেন আমি যেন সেই সময় উপস্থিত্ত থাকি। বেশ অনেকক্ষণ ধরে হারীন শাহ ১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে তাইপের বিমান-দুর্ঘটনার খুঁটিনাটি বলে গেলেন। বোঝাই গেল ভদ্রলোক বিমান-দুর্ঘটনার ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন যে তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন। আমি বুঝতে পারছিলাম, ঐ কাহিনী শুনতে বাবার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। মুখ থমথমে ও লাল হয়ে গিয়েছিল। তবে যে-কোনো কারণেই হোক বাবা হারীন শাহকে বিশেষ কোনো প্রশ্ন বা জেরা করেননি। আমিও কোনো প্রশ্ন তুলিনি। কথা শেষ করে ভদ্রলোক বিদায় নেবার পর বাবা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি কী আর বলি। একটু ভেবে নিয়ে বললাম, যত সব সাজানো গল্প। আজগুবি কথা। আপনি শুয়ে পড়ুন। বাবা সেই রাতে ঘুমিয়েছিলেন কিনা জানি না। আমার মাথাও অনেকক্ষণ ধরে ঝিমঝিম করেছিল।

প্রাগ থেকে আমরা যাব ভিয়েনায়, বাবা-মার ইউরোপ সফরের প্রধান গন্তব্যস্থান। বসুবাড়ির শিরোমণি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সহধর্মিণী ও শিশুকন্যার প্রথম দেখা হবে। আমাদের সকলের মন গভীর আবেগ ও চাপা বেদনায় ভরা। আমাদের প্লেন যখন ভিয়েনায় পৌঁছল তখন বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কথাই ছিল আমাদের কাকিমা এয়ারপোর্টে আসবেন না। এয়ার টারমিনালে বা এয়ারলাইনের শহরের অফিসে অপেক্ষা করবেন। ভিয়েনায় পৌঁছেই আমাদের সকলের একই চিন্তা—এই প্রথম সাক্ষাৎটি

কেমন হবে। আমি তো প্লেন থেকে নামার সময় অন্যমনস্ক হয়ে বাবার দেওয়া নতুন ক্যামেরাটি ফেলে চলে এলাম। বাসে চেপে অন্ধকারের মধ্যে এয়ারপোর্ট থেকে এয়ার টারমিনালে পৌঁছতে যেন অনেকক্ষণ কেটে গেল। এয়ার টারমিনালের হলে ঢুকতেই আশ্চর্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, শান্ত ও স্নিগ্ধ চেহারার ছোটখাটো এক ইউরোপীয় মহিলা ধীর পদক্ষেপে বাবার দিকে এগিয়ে এলেন। পরিচয় করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। পরস্পরকে ছবিতে তো দেখাই আছে। প্রথমেই তিনি খুব নম্রতার সঙ্গে একখানি খাম বাবার হাতে দিলেন। তার মধ্যে ছিল ১৯৪৩ সনের ফেবরুয়ারি মাসে বাবাকে লেখা রাঙাকাকাবাবুর মূল চিঠিটি। চিঠিটি একবার দেখে নিয়েই বাবা বুকের পকেটে সেটি রাখলেন। চিঠির প্রতিলিপি বাবা অনেক আগেই পেয়েছিলেন, খুঁটিয়ে পড়বার কোনো প্রয়োজন ছিল না। দুজনেই পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর কম কথায় কুশল-বিনিময় হল। বসুবাড়ির দুই বধূ কথা না বলে পরস্পরের হাত ধরে রইলেন। তাঁদের মনের কথা মনেই রয়ে গেল। বাবা অনীতার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আশা করছিলেন তাকেও সেইদিনই দেখতে পাবেন। শুনলেন সাগরপার থেকে তার আত্মীয়রা আসছেন শুনে সে খুবই উত্তেজিত হয়ে আছে। কাকিমা আমাদের দিকে ঘুরে এসে এমনভাবে কথা বললেন যেন পরিচয় অনেক আগেই হয়ে গেছে। বাবার দিকে ইঙ্গিত করে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ইট্ ইজ্ হি প্লাস টেন ইয়ার্স!' ততক্ষণে আমার খেয়াল হয়েছে ক্যামেরাটি প্লেনে ফেলে এসেছি। টেলিফোনে এয়ারপোর্টে যোগাযোগ করা হল, কোনো ফল হল না।

হোটেলে পৌঁছে পরের দিনের প্রোগ্রাম ঠিক হল। হোটেলটি ভিয়েনার কেন্দ্রে। আমাদের যেতে হবে শহরের উত্তর প্রান্তে, যেখানে একটি ছোট ফ্ল্যাটে অনীতা তার মা ও দিদিমার সঙ্গে থাকে। পরের দিন সকালবেলাটা বিশ্রামের জন্য রইল। দুপুরে আমরা সকলে মিলে কাকিমার বাড়িতে যাব। অনীতাকে তিনি প্রস্তুত করে রাখবেন।

সেই রাতে তাঁকে একলা বাড়ি ফিরতে হবে ভেবে বাবা ব্যস্ত হলেন। যদিও যুদ্ধের পর তিন বছর কেটে গেছে, পথঘাটের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নানা কথা তখনও শোনা যেত। ভিয়েনা শহরটিকে চার ভাগ করে চারটি শক্তি আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দখল করে রেখেছে। দখলকারীরাই সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ভিয়েনাবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনেক অসুবিধা। তবে এই শান্ত ও শক্ত মহিলাটি তো গত পাঁচ বছর একলাই এক গুরুভার বহন করে এসেছেন। তাঁর পক্ষে একলা বাড়ি ফিরে যাওয়াটা এমন কী বড় কথা!

(ক্রমশ)

গান্ধীজি তখন দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্যে অনশন শুরু করেছেন। একদিন সকালে সুশীলা নায়ার জিজ্ঞেস করলেন, বাপুজি, কাল রাত্রিতে আপনি ঘুমের মধ্যে দু'হাত উপরে তুলে যেন একটা কিছু বেয়ে উপরে উঠতে চাইছিলেন। এর মানে কী? গান্ধীজি বললেন, কাল সারারাত স্বপ্ন দেখেছি, একটা দেওয়াল পেরোতে চাই, কিন্তু কিছুতেই উপরে উঠতে পারছি না।

ধাঁধা

রান্নার গ্যাস নিয়ে কদিন ধরেই বাড়িতে আলোচনা চলছে। একবার ফুরোলে চট করে পাওয়া যায় না। কখনো-কখনো দু-আড়াই মাসও লেগে যাচ্ছে। সেজদাদু বলছিলেন, আগে নাকি এক ঘণ্টার মধ্যে এসে যেত রান্নার গ্যাসের নতুন সিলিণ্ডার। শুধু জানিয়ে দিলেই হল। আর এখন ? কী দিনকালই না পড়েছে !

ছোট্কা সেজদাদুকে একটু খেপিয়ে দেবার জন্যই বোধহয় বলল, "তখন তো বাড়িতে-বাড়িতে কড়া নেড়ে গ্যাস-কোম্পানির লোক এসে গ্যাসে রান্নার উপকারিতা বোঝাত।"

সেজদাদু কিন্তু একটুও খেপলেন না। বললেন, "ঠিকই বলেছ। তোমার মনে আছে দেখছি।"

ছোট্কা বলল, "মনে আছে বলেই তো বলছি।" একটু থেমে ছোট্কা আবার বলল, "তবে এভাবে দীর্ঘদিন চলবে না। সারা পৃথিবীতে তেল-গ্যাস-কয়লার, অর্থাৎ প্রাকৃতিক জ্বালানির, মজুত ভাণ্ডার যে ফুরিয়ে যেতে চলেছে, এ-কথা মনে রেখে আমাদের এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।"

"সে কী ! এ আবার তুমি কী শোনালে ?" হাঁ হাঁ করে উঠলেন সেজদাদু।

ছোট্কা নির্বিকার গলায় বলল, "প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেল দেবেন ঘনাদা' পড়লেই সব জানা যাবে।" ছোট্কা উঠে গিয়ে ঘর থেকে একটা মলাট-দেওয়া বই এনে সেজদাদুর হাতে দিল। বলল,"এতেই খবরটা রয়েছে।"

সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে ছোট্কা যে গ্যাসের দোকান ঘুরে এসেছে সেটা টের পেলাম নতুন ধাঁধা দেখে। পেট্রল নিয়ে ধাঁধা, এ নির্ঘাত পেট্রল পাম্প-এর দোকানের প্রভাব।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা দোকানে ৪০০ খদ্দেরের ২১ দিন চলার মতো পেট্রল রয়েছে। ৭০০ খদ্দেরের কত দিন চলবে সেই পেট্রলে ?

নীচে তিনরকম উত্তর দেওয়া হল। কোন্‌টি ঠিক তা মুখে মুখে হিসেব করে বলতে হবে—

(ক) ১০ দিন (খ) ১৪ দিন (গ) ১২ দিন

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ধরা যাক, ক ও খ দুটি সংখ্যা। ধরা যাক খ থেকে ক বিয়োগ করলে উত্তর হয় গ। খ, অবশ্যই ক-এর থেকে বড়। তাহলে গ ও ক-এর যোগফল কি খ-এর সমান হবে ? নাকি কম ? কিংবা বেশি ?

এর উত্তরও চটপট বলার। নীচের তিনটি উত্তরের মধ্য থেকে ঠিকটিতে টিক মারা—

(ক) সমান (খ) কম (গ) বেশি

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

করাথামশ্রীতঞ্চশ্রীকৃম্

গতবারের উত্তর ॥ (১) জয় ৩৯ হাজার, বিজয় ২১ হাজার, সঞ্জয় ১২ হাজার। (২) গ ৬৩। (৩) ৩৪৩ (৪৯×১৪÷২)।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

ঝি			
	কি		
		মি	
			কি

শব্দসন্ধানে একটু মুখ পালটানো যাক। এবারের ছকে দ্যাখো, উপর-নীচে কোনাকুনি একটি শব্দ দেওয়া রয়েছে—ঝিকিমিকি। তারা বা জোনাকির মৃদু আলোর ভাব। এবার এই শব্দটির নড়চড় না-ঘটিয়ে সংকেত-অনুযায়ী পাশাপাশি চারটে একই ধরনের শব্দ তৈরি করো। একই ধরনের বলতে, শব্দের প্রতিটি বর্ণই ই-কারযুক্ত হবে।

সংকেত : (১) জানালার শোভা। (২) দোকানি ও খদ্দেরের মিলিত কাজ। (৩) বিনা কারণে বা সত্যি নয়। (৪) চাপা আগুন যেভাবে জ্বলে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

খো	না		মা		রা	হা
ক্ক		ডা	হু	ক		তি
স	ভা		ত		টে	মি
	র	ক্ষী		বি	বি	
স্বা	তী		জ্যো		ল	ঘু
ধী		ফে	লু	দা		গ
ন	ক্ত		ই		চু	নি

মজার খেলা

বারোটি দেশলাইকাঠি দিয়ে বন্ধুর বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নেওয়া। এটাই এবারের সহজ, সুন্দর, মজার খেলা।

নীচের অঙ্কের মতো করে টেবিলের ওপর দেশলাইকাঠিগুলোকে সাজিয়ে নাও প্রথমে—

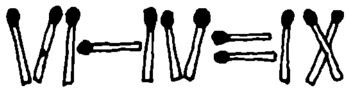

অঙ্কটায় দেখানো আছে যে, ৬ থেকে ৪ বিয়োগ করলে ৯ হয়। অঙ্কটা সম্পূর্ণই ভুল। বন্ধুর কাজ হবে, একটা কাঠিকে এমনভাবে সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখা, যাতে কিনা একটা ঠিক অঙ্ক টেবিলে থাকে।

বন্ধু পারুক না পারুক, তুমি সমাধানটা শিখে নাও। আগে নিজে চেষ্টা করো। তাতেও যদি না হয়, নীচের দু-দুটো সমাধান দ্যাখো—

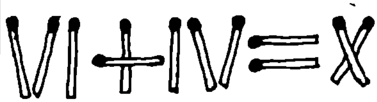

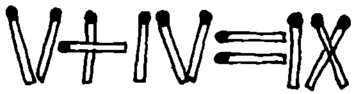

খুবই সহজ, খুবই সুন্দর এবং খুবই মজার। তাই না?

মজারু

কিসের ফোটো

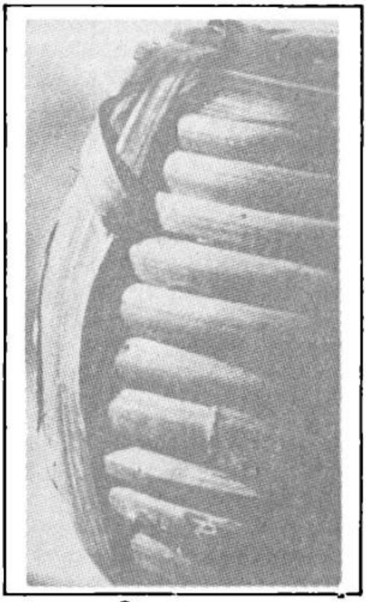

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল কীটনাশক স্প্রেয়ারের ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কী হে, টাটকা বলে কাল যে ডিম বিক্রি করলে, তা থেকে আজ তো দেখছি ছানা ফুটে বেরুচ্ছে, ব্যাপারটা কী ?

উঃ ব্যাপার তো ভালই, ১৬ টাকা কেজি হিসাবে মুরগির দাম ধরে, বাকি টাকাটা দিয়ে যান।

প্রঃ এটা যে সামন্তবাবুর সই, তুমি জানলে কী করে ?

উঃ আমার থেকে বেশি আর কে জানবে হুজুর, আমি যে নিজের হাতে সইটা করেছি।

সুসেন

হাসিখুশি

"আপনাদের হোটেলের রান্নাঘর ভারী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ভাল লাগল, অন্য খদ্দেরদের আমি বলে দেব।"

"আপনি কী করে বুঝলেন, আমাদের রান্নাঘর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ?"

"বুঝব না কেন ? আপনাদের প্রতিটি খাবারেই যে সাবান আর ফিনাইলের গন্ধ !"

ফার্নিচারের দোকানের মালিক এক ক্রেতাকে বললেন, "এটা আপনার জানা উচিত আমি কাঠ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।"

স্পষ্টভাষী ক্রেতাটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "তাহলে তখন থেকে আম কাঠকে মেহগনি কাঠ বলে চালাতে চাইছেন কেন ?"

"বারবার তোমার মুখ থেকে 'ইডিয়েট' কথাটা শুনছি—আশা করি তুমি আমাকে বলছ না ?"

"নিজের সম্পর্কে অত গর্বিত না হলেও চলবে। তুমি ছাড়া পৃথিবীতে ইডিয়েট আর কেউ নেই নাকি ?"

"বাজার করে ফিরতে এত দেরি হল কেন আশু ?"

"আজ্ঞে বাবু, বাজার তো তাড়াতাড়িই করেছি। মাছের দাম বাড়িয়ে বলব, না পটলের, এই ভাবতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

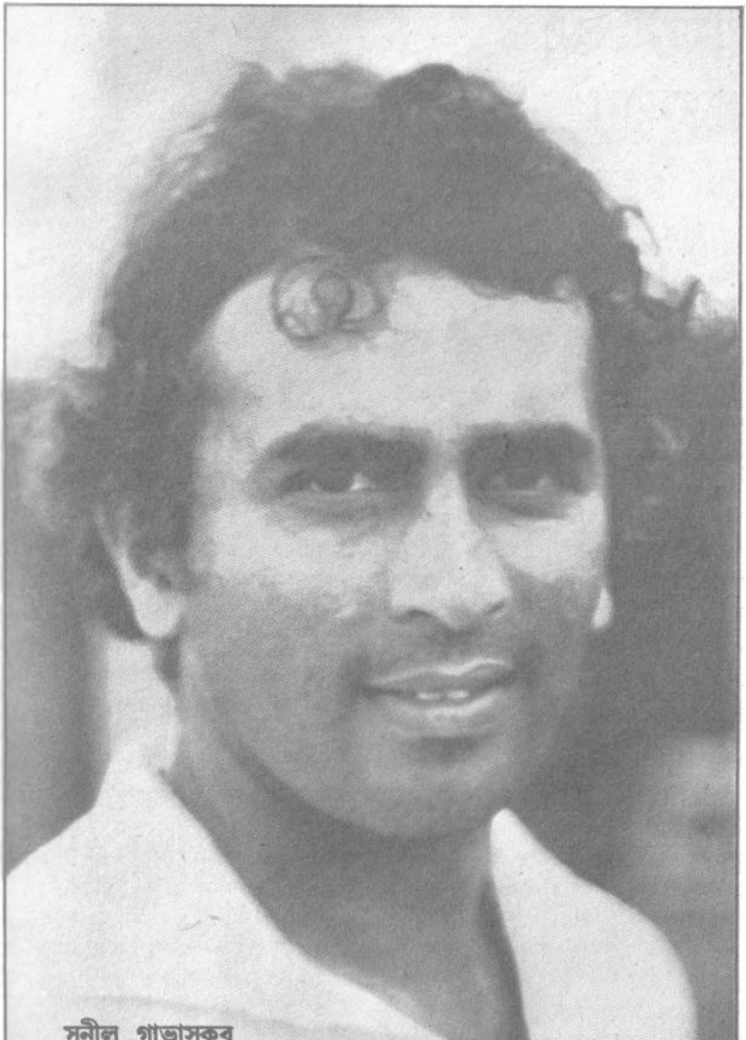

সুনীল গাভাসকর
ফটো : নিখিল ভট্টাচার্য

 (পাতা ওলটালেই ক্রিকেটের খবর)

সামনে শুধু ব্রাডম্যান

মণীশ মৌলিক

গ্যারি সোবার্সকে ছুঁতে বাকি ছিল মাত্র একটা সেঞ্চুরি। অর্থাৎ, গাভাসকর যখন এইবার পাকিস্তান সফরে যান, তখন তাঁর ঝোলায় মজুত ছিল পঁচিশটা শতরান। ছাব্বিশতম শতরান সফরের গোড়াতেই পেয়ে যেতেন তিনি, যদি ভাগ্য তাঁকে একটু সাহায্য করত। আশির ঘরে পৌঁছে গাভাসকর সেঞ্চুরি না করে ফিরছেন, এমন কথা এখন আমাদের ভাবতে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু শুধু নৈপুণ্য নয়, ভাগ্যও ক্রিকেটে একটা মস্ত বড় ব্যাপার। তাই সেবার প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছেও, তাঁকে মন খারাপ করে ফিরে আসতে হয়েছিল।

অবশ্য সে দুঃখ সানি আমাদের মনে বেশি দিন থাকতে দেননি। ফৈজলাবাদে তৃতীয় টেস্টে একটি স্মরণীয় ইনিংস খেলেছেন ভারতের অধিনায়ক—১২৭ নট আউট। গোড়াপত্তন করতে নেমে ইনিংসের শেষ অবধি অপরাজিত থাকার কৃতিত্ব এর আগে কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যানের কপালে জোটেনি। দ্বিতীয় ইনিংসে সানি যখন প্যাভেলিয়নে ফিরলেন, তখন তিনিই একমাত্র অপরাজিত ব্যাটসম্যান। অর্থাৎ আর একটি রেকর্ড বাড়ল। ইংল্যাণ্ডের অ্যাবেল, ওয়ার্নার ও হাটন, অস্ট্রেলিয়ার ব্যারেট, আর্মস্ট্রং, ব্রাডসলে, উডফুল, ব্রাউন, লরি ও রেডপাথ, দক্ষিণ আফ্রিকার ট্যানক্রেড, জুলখ্, গডার্ড ম্যাকগ্লে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওরেল এবং হান্ট, নিউজিল্যাণ্ডের টার্নার ও পাকিস্তানের নজর মহম্মদের নামের পাশে আরও একটি নাম যুক্ত হল।

সেঞ্চুরির জন্যে দৌড়

সানির ছাব্বিশটা সেঞ্চুরি মানে বিশ্বরেকর্ড তৈরি করতে আর দরকার চারটি সেঞ্চুরির। মাত্র একটি লোককে ডিঙিয়ে যেতে হবে, সেই গৌরবের মালা গলায় পরার জন্য। উনত্রিশটা শতরান কেবলমাত্র ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যানের পকেটেই আছে। সেই সূত্রে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ডটিও তাঁর হাতে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্যার গারফিল্ড সোবার্সের শতরানের সংখ্যাকে ছুঁয়ে ফেলার পর, সানির এখন লক্ষ্য হবে ব্রাডম্যানের রেকর্ড ভেঙে ফেলা। ক্রিকেটের জীবিত কিংবদন্তির যে ঐতিহাসিক কীর্তি একসময় ছোঁয়া অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, ভারতীয় ব্রাডম্যান সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছেন।

সানি একদিন ব্রাডম্যানকে ছুঁয়ে ফেলবেন। সে দিন খুব দূরে নয়। তারপর? তারপর আমাদের প্রিয় সানি নতুন বিশ্বরেকর্ড করে নিজেই মহানক্ষত্র হয়ে বিরাজ করবেন ক্রিকেটের ইতিহাসের আকাশে।

ভারত ভেঙে পড়ল

সম্রাট রায়

ফোর্থ টেস্ট শেষ হতেই টিভি কমেণ্টারি বক্সে ঢুকলেন ইমরান। সিরিজ জয়ের আনন্দ তখন তাঁর সারা মুখে। একটি চেয়ারে বসে ছিলেন বিমর্ষ গাভাসকর। ইমরানকে দেখে মৃদু হেসে অভিনন্দন জানালেন। খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল সানিকে। আসিফ ইকবালের কাছ থেকে একদা ছিনিয়ে-নেওয়া 'রাবারটি' আবার সানিকেই হাতে করে ফিরিয়ে দিতে হল।

অথচ সফরের শুরুতে অনেকেই আশা করেছিলেন, পাক-ভারত লড়াই এবার দারুণ জমবে। কিন্তু জমেনি। কারণ প্রথম টেস্টের পর থেকেই হাওয়া উল্টো মুখে ঘুরতে শুরু করেছে। সত্যি কথা বলতে কী, পাকিস্তানের পিচে ভারতের দুই ম্যাচ-উইনিং বোলার কপিলদেব এবং দোশি আশ্চর্যরকম নিরাশ করেছেন। ভারতের নির্বিষ বোলিংকে থেঁতলে দিয়ে প্রতি টেস্টেই পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা খুশিমতো রান করেছেন। টপ-অর্ডার ব্যাটসম্যানরা কীরকম ভয়ঙ্কর ফর্মে ছিলেন তা বোঝাতে শুধু এটুকু বললেই হবে যে, প্রথম চারটি টেস্টে মহসিন, মুদাস্‌সর, মিয়াঁদাদ এবং জাহির যেন মুড়িমুড়কির মতো সেঞ্চুরি, ডবল-সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। দ্বিতীয় টেস্ট থেকেই প্রমাণ হতে শুরু হল ভারতীয় বোলিং কতখানি অসহায়, দুর্বল।

কিন্তু শুধু বোলিং কেন। ভারতের ব্যাটিংয়েরই কি কোনো ছিরি ছিল? ইমরানের ভয়ঙ্কর পেস বোলিংয়ের ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। খুব খারাপ লাগবে হয়তো, তবু বলতেই হচ্ছে, স্রেফ ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে ব্যাটসম্যানরা উইকেটে থাকার চেয়ে প্যাভিলিয়ানকেই নিরাপদ আশ্রয় ভেবে নিয়েছেন। তবু ওরই মধ্যে ব্যাট হাতে লড়াইয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সুনীল গাভাসকর এবং মহিন্দর অমরনাথ। কিন্তু একজন গাভাসকর এবং একজন মহিন্দরের পক্ষে কি ভগ্নদশা ব্যাটিংয়ের সব ফুটো বন্ধ করা সম্ভব? বিশ্বনাথ, অরুণলাল, শ্রীকান্ত, বেংসারকর, পাটিল, কপিলদেব, কিরমানির মধ্যে কেউ কি নিজের নামের প্রতি সুবিচার করেছেন? একটা সময় সত্যিই ছিল যখন বিশ্বনাথের ব্যাটিং আমাদের মুগ্ধ করত। ফর্মের দিকে তাকিয়ে বিশ্বনাথের নিজেরই বোঝা উচিত যে, তাঁর ক্রিকেটে এখন রঙের বড় অভাব।

সিরিজ শেষ হবার পরে যদি প্রশ্ন ওঠে পাকিস্তানের জয়ের পেছনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি, তাহলে ইমরানের সঙ্গে যে নামটি উঠবে সেটি জাহির আব্বাসের। বল হাতে ইমরান যদি ভয়ঙ্কর হন, তাহলে ব্যাট হাতে জাহির দুর্ধর্ষ।

ইমরান

জাহির আব্বাস

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

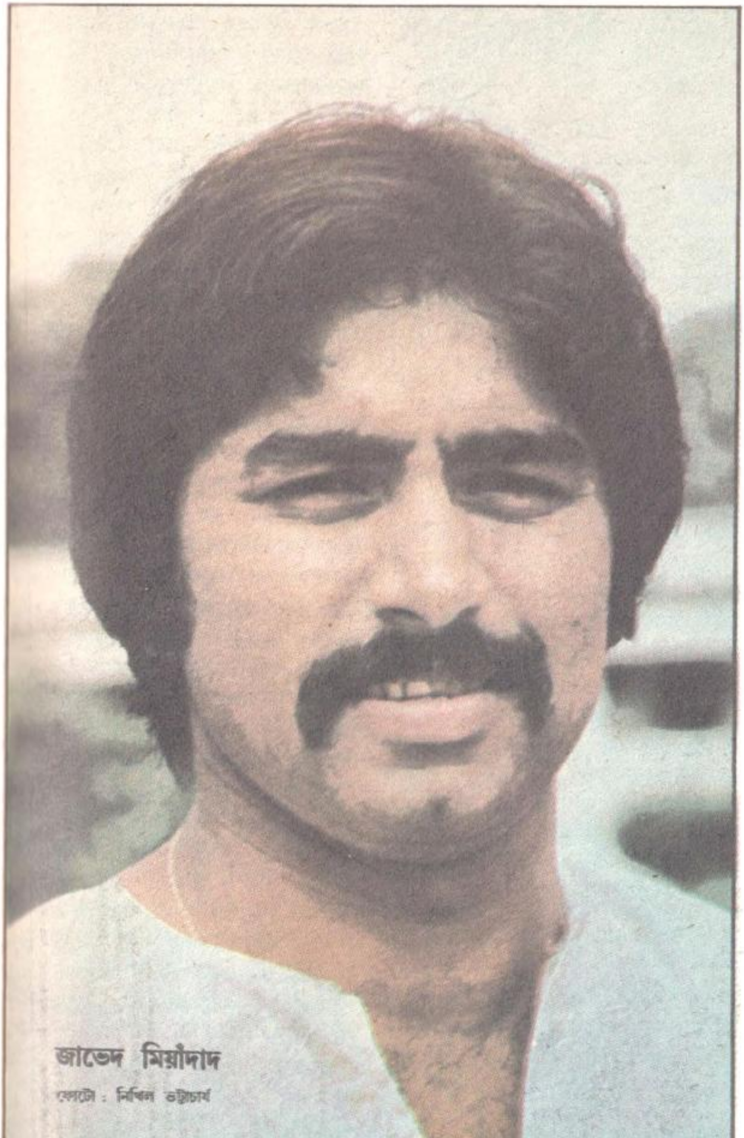

জাভেদ মিয়াঁদাদ

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

রেকর্ড, শুধু রেকর্ড

মণি শর্মা

হায়দরাবাদ টেস্টে জিতে পাকিস্তান সিরিজ জয় করল। তবে রেকর্ডের পর রেকর্ডের জন্যও পাকিস্তানের কাছে এই টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তৃতীয় উইকেটের জুটিতে মিয়াঁদাদ-মুদাস্‌সর তো রেকর্ড ভাঙার খেলায় মেতেছিলেন। ১৯৭৯ সালে, গ্রেগ চ্যাপেলের অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ফৈজলাবাদে, তৃতীয় উইকেটে রেকর্ড করেছিলেন তসলিম আরিফ-মিয়াঁদাদ। সংগৃহীত রান ছিল ২২৩। মিয়াঁদাদ-মুদাস্‌সর সেটি ভেঙেছেন।

'৭৩ সালে, নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মুস্তাক মহম্মদ এবং আসিফ ইকবাল পাকিস্তানের যে-কোনো জুটিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েছিলেন। ডুনেডিনে, দ্বিতীয় টেস্টে তাঁরা ৩৫০ রান তুলে নতুন নজির স্থাপন করেছিলেন। দশ বছর বাদে মিয়াঁদাদ-মুদাস্‌সর সেটি টপকে গেলেন।

জুটি ৪৫১ রানে পৌঁছে গেলে, সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, **ব্রাডম্যান-পন্সফোর্ডের রেকর্ড ভাঙার** জন্য। ডন ব্রাডম্যান ও বিল পন্সফোর্ড ১৯৩৪ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে এই পাহাড়প্রমাণ রানসংখ্যার বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন। কোনো জুটিই পৃথিবীতে এত রান সংগ্রহ করতে পারেনি। মিয়াঁদাদ-মুদাস্‌সর এই বিরাট নজির ছুঁয়েছেন বটে, কিন্তু ভেঙে ফেলতে পারেননি। তার আগেই মুদাস্‌সর আউট হয়ে যান। উল্লেখযোগ্য, সেবার ব্রাডম্যান-পন্সফোর্ড দুজনেই ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। এখানেও দুজনে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। জীবনের সর্বোচ্চ রান করে আউট হয়েছেন বলে মুদাস্‌সরের হয়তো মনে তত দুঃখ নেই। আফসোস করছেন জাভেদ। ইমরান যদি তখন ইনিংসটা ছেড়ে না দিতেন তাহলে হয়তো প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরি পেতেন মিয়াঁদাদ। আক্ষেপ জাহিরেরও কি নেই? কারণ, উইক্‌সের বিশ্বরেকর্ড ভাঙার সুখস্বপ্নে তিনি যখন মশগুল, তখন পাক অধিনায়ক সেটা কাঁচের খেলনা গুঁড়ানোর মতো করে ভেঙে দিলেন। জাহিরকে কেঁচেগণ্ডুষ করতে হবে, মানে ফের নতুন করে বিশ্বরেকর্ড গড়ার খেলায় নামতে হবে। জানো নিশ্চয়ই, জাহিরই পাকিস্তানের একমাত্র ব্যাটসম্যান, যিনি চার হাজারের বেশি রান করেছেন। এ-টেস্টেই জাহির চার হাজার পেরোলেন। ইমরান হায়দরাবাদে আটটি উইকেট পাওয়ার সুবাদে সিরিজে এখনও মোট তেত্রিশটি উইকেট পেয়েছেন। এক মরসুমে এটি তাঁর সর্বোচ্চ উইকেটপ্রাপ্তি। এ টেস্টে প্রথম ইনিংসে নবাগত সাঁধুর উইকেট নিয়ে সরফরাজের শিকারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল দেড়শো।

বিশ্বনাথ (রেকর্ড, কিন্তু রান কোথায়?)

বিশ্বনাথ পরপর পঁচাশিটা টেস্ট খেলে, এ ম্যাচে সোবার্সের বিশ্বরেকর্ডকে স্পর্শ করেছেন।

অ্যাশেজ অস্ট্রেলিয়ার

অশোক রায়

ইঙ্গ-অস্ট্রেলিয়া 'অ্যাশেজ' সিরিজ শেষে একটা পুরনো কথা আবার মনে পড়ে গেল—"ক্রিকেট ক্যাপ্টেন তৈরি করা যায় না, তাঁরা জন্মান।"

পাকিস্তানের কাছে সম্প্রতি শোচনীয়ভাবে ০—৩ ম্যাচে সিরিজ হেরে যাবার পরে অস্ট্রেলিয়া দল যখন রীতিমত ধুঁকছে তখন ভগ্নপ্রায় টিমের যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন নতুন ক্যাপ্টেন গ্রেগ চ্যাপেল। ক্যাপ্টেনশিপ ফিরে পেয়েই গ্রেগ চিরশত্রু ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পার্থে প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করলেন। যদিও সেই টেস্ট অমীমাংসিত রইল কিন্তু গ্রেগের ব্যাটে অস্ট্রেলিয়া বাঁচার আশ্বাস ফিরে পেল। পরের দুটি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া সহজেই জিতল। এবং গ্রেগের ব্যাট সে দুটিতেও একটি সেঞ্চুরি ও একটি 'ফিফটি' উপহার দিল অস্ট্রেলিয়াকে।

ব্যাট হাতে গ্রেগ যদি দলকে অনুপ্রাণিত করে থাকেন তাহলে অস্ট্রেলিয়াকে জয়ের নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছেন ফাস্ট বোলার জিওফ লসন। অথচ প্রথম টেস্টের পরে অস্ট্রেলিয়ার বোলিং-আক্রমণের প্রধান অস্ত্র দুটি লিলি এবং অলডারম্যান আঘাতজনিত কারণে শেষ পর্যন্ত দলছুট হওয়ায় আক্রমণের দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে নবীন জিওফ লসনের ওপর। দু-দু'জন সুখ্যাত পেস বোলার লিলি এবং অলডারম্যানের অভাব অস্ট্রেলিয়াকে বুঝতে দেননি লসন।

গ্রেগ চ্যাপেল

তবু ইংল্যাণ্ড লড়াই বাধিয়েছিল। চতুর্থ টেস্টে দারুণ উত্তেজনার মধ্যে মাত্র তিন রানে ম্যাচ জেতে ইংল্যাণ্ড। সিরিজের ফলাফল তখন ২—১। পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট জিতে 'অ্যাশেজ' নিজের কাছে রাখতে ইংল্যাণ্ড তখন মরিয়া। ওদিকে অস্ট্রেলিয়াও একই সঙ্গে সিরিজ জিততে এবং 'অ্যাশেজ' ফিরিয়ে আনতে গভীরভাবে আগ্রহী। এইরকম দারুণ টেনশানের মধ্যে শুরু হল শেষ টেস্ট। এবং সকলের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ম্যাচটি শেষ হল অমীমাংসিতভাবে। শেষের সেই ভয়ংকর ম্যাচটি অস্ট্রেলিয়ার মুঠোয় এনে দিলেন কে বলো তো ? না, গ্রেগ চ্যাপেল বা জিওফ লসন নন। যাঁর হাত থেকে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেনশিপ সাময়িকভাবে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেই কিম হিউজ একটি অনবদ্য সেঞ্চুরি করে হয়তো জানালেন 'আমাকে মনে রেখো।'

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সবচেয়ে হতাশ ক্রিকেটারটির নাম ইয়ান বথাম। তাঁর অলৌকিক ক্রিকেট থেকে আশ্চর্য কারণে বঞ্চিত থাকায় বব উইলিসের ইংল্যাণ্ড বাধ্য হল অ্যাশেজের শতবর্ষে 'অ্যাশেজ'কে অস্ট্রেলিয়ার হাতে তুলে দিতে।

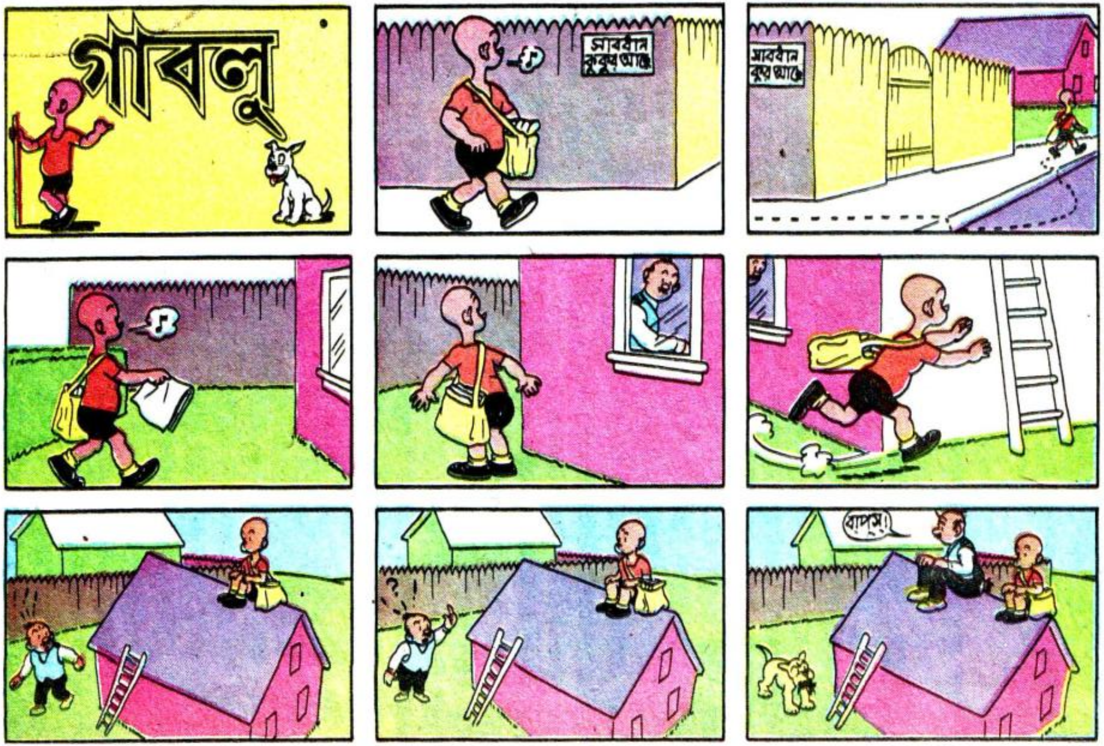
গাবলু
সাবধান কুকুর আছে
সাবধান কুকুর আছে
বাপস্!

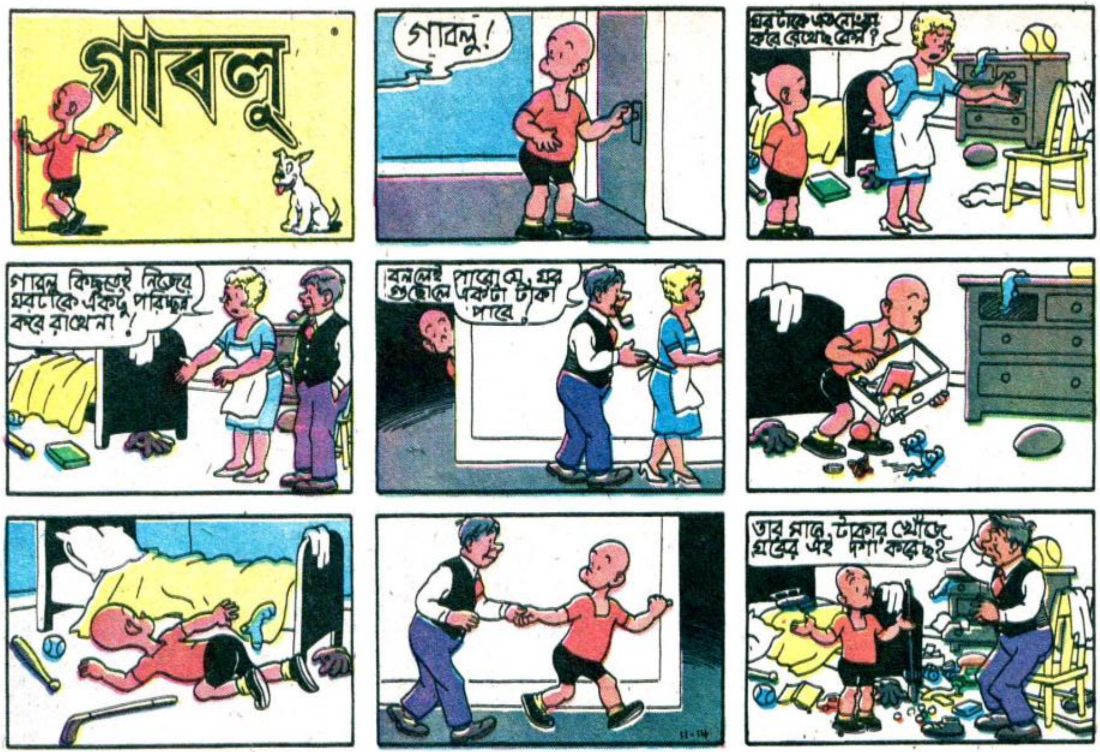
গাবলু
গাবলু!
ঘর টাকে এত নোংরা করে রেখেছ কেন?
গাবলু কিছুতেই নিজের ঘরটাকে একটু পরিষ্কার করে রাখে না!
বললেই পারো যে, ঘর গুছোলে একটা টাকা পাবে!
তার মানে, টাকার খোঁজে ঘরের এই দশা করেছ?

অশ্রুজলে অ্যা-র বিদায়

বাচস্পতি

পেট ভরে ফুলকপির রোস্ট খেয়ে খুশির উদ্‌গার তুলে সোফায় এসে বসলেন হিগিনকাকু, হাতে কালো কফির কাপ।

বাবা আর ভন্টু বসলেন উলটোদিকে। হিগিনকাকু বললেন, "এবার অশ্রুজলে অ্যা-কে বিদায় জানানো যাক। 'অ' আর 'অ্যা' এই দুজনেই অনেকদিন আমাদের সঙ্গে ছিল। বাংলা স্বরধ্বনির এই দুটি ফচকে ফিচেল বালককে নিয়েই ঝামেলা। 'অ' যে কখন ফাঁক পেলেই 'ও' হয়ে যাচ্ছে, আর 'অ্যা' কখন কী সুবাদে 'এ' হয়ে যাচ্ছে— সেটা যে ধরতে পারবে না সে স্ট্যান্ডার্ড বাংলাটাও জানে না বলে ধরে নিতে হবে। 'অ'-এর সূত্রগুলো তোমাদের দিয়েছি, 'অ্যা'-এর বিষয়ে দু-একটি সূত্রও বলেছি তোমাদের। এখন 'অ্যা' বিষয়ে কতকগুলো কাজের কথা বলব, ভন্টুবাবা, খাতায় নিকে রাকো।"

ভন্টু অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাতাটা খুলল, কলম বাগিয়ে ধরল। হিগিনকাকু বললেন, "প্রথমত, শব্দের মাঝখানে 'অ্যা' ঠিক আসে না। উপসর্গ থাকলে মনে হয় অনেক শব্দে 'অ্যা' মাঝখানে আছে। যেমন অন্যায়, অধ্যায়, অব্যাহত, অখ্যাত। উপসর্গ তুলে নাও, দেখবে ওসব 'অ্যা' আসলে শব্দের গোড়াতেই। এই হল গিয়ে এক।"

ভন্টুর 'গুপি গায়েন বাঘা বায়েন'-এর গান থেকে "এক নম্বর, এক নম্বর" গেয়ে ওঠার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু গাঁট্টা খাবার ভয়ে চুপচাপ রইল।

"দুই, গোড়ায় না থাকলে য-ফলা আকারের (্যা) উচ্চারণে 'আ'-ই স্বাভাবিক। হত্যা হবে [হোত্তা], সন্ধ্যা হবে [শোন্ধা], সমস্যা হবে [শমোশ্‌শা], অগত্যা হবে [অগোত্তা]। কিছুতেই [হোত্যা], [শোন্ধ্যা], [শমোশ্‌শ্যা], [অগোত্যা] নয়। তবে [বিজ্ঞান] [বিজ্ঞ্যান], [অজ্ঞাত] [অজ্ঞ্যাত], দুই-ই আপাতত চলবে। আমার ধারণা, পরে এসব জায়গায় 'আ' 'অ্যা'-কে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে।

"তিন নম্বর, যুক্তব্যঞ্জনে এ-কার সবসময় 'এ', কখনোই 'অ্যা' নয়!

"চার, কিছু তৎসম শব্দে প্রথম অক্ষরে এ-কার এবং পরের অক্ষরে 'য়' থাকলে, ঐ এ-কার 'অ্যা' হবে না—যেমন দেয়, পেয়, হেয়, গেয়।

"পাঁচ, দ্বিতীয় সিলেবলে (উচ্চারণ করে দ্যাখো) 'ই' বা 'উ' ধ্বনি থাকলে গোড়ার এ-কার 'এ' হিসেবেই উচ্চারিত হবে। যেমন পেঁচি, নেকু, বেটি, হেংলু। ব্যস, এবার অ্যা-এর বিদায়-সংগীত গাইছি—" বলে হিগিনকাকু হেঁড়ে গলায় গান ধরলেন,

"বুড়োটা ছিল ভাল-ও-ও।
চাষ করিত বোম্বাই মুলো-ও-ও,
রাতের বেলা ধুনতো তুলো-ও-ও,
বুড়োটা ছিল ভাল-ও-ও।"

তারপর সোফায় দেহ এলিয়ে দিয়ে নাকের ভাষাতত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। (ক্রমশ)

একটু কাজের কথা

প্রসাদ

চামেলি আর চম্বলের গল্প একটু থামিয়ে এবার দু-একটা কাজের কথা বলে নেওয়া যাক।

'সহজে ইংরেজি'-র আসরে যারা প্রথম থেকেই যোগ দিচ্ছ তারা অবশ্য নিজেরাই জানো কেন আমাদের এই আসরে ব্যাকরণ নিয়ে মাথা ঘামানোর বালাই মোটেই নেই, কেন গল্পটাই আসল, আর সেই গল্পের শেষে প্রত্যেকবার কয়েকটি ইংরেজি বাক্য কিংবা বাক্যাংশের দিকে তোমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে বলা হয়। কিন্তু আমাদের আসর তো চলছে অনেকদিন ধরে। আরম্ভের পরেও অনেকে নিশ্চয় এসেছ। এসেই সব আমাদের নতুন বন্ধুরা হয়তো মাঝেমাঝে ভাবো, কিংবা তোমাদের মা-বাবারা ভাবেন, এ আবার কী-রকম ইংরেজি শেখা হচ্ছে? ব্যাকরণ কোথায়?

এ আমাদের ইস্কুলের ক্লাস-ঘর নয়। গল্প করতে করতে সহজে ইংরেজি শেখার আসর। আর আসল কথা হল, ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করে ভাষা শিখবার চেষ্টা করা বোকামি। শুনতে শুনতে, বলতে বলতে, তারপর পড়তে পড়তে, লিখতে লিখতে মানুষে ভাষা শেখে।

তোমরা চামেলি-চম্বলের কথা পড়ে চলেছ। তার মধ্যে যে কথাগুলো ইংরেজিতে সেগুলো যদি একটু বেশি মন দিয়ে পড়ো, দেখবে নানা ধরনের ইংরেজি বাক্যের কী-রকম সব চেহারা, যা বলবার তা ইংরেজিতে কী-রকমভাবে সাধারণত বলা হয়ে থাকে, শব্দের পিঠে শব্দ কেমনভাবে বসে।

কিন্তু একটা কথা সব সময়ে মনে রাখবে। শুধু পড়ে গেলেই হবে না। নিজে না লিখলে, না বললে কোনো ভাষার উপরেই দখল আসে না। শুধু চোখের দেখায় কিছু হয় না, হাতে হাতে মেলাতে হয়।

যেমন ধরো, তুমি পড়লে :

Mrs. Roy was happy and so was Mr. Roy.

এই ধরনের কথা এইভাবে বলা যদি রপ্ত করতে চাও, যাতে দরকার হলে তুমিও এভাবে বলতে পারো, তাহলে প্রথমেই নিজে এ-রকম কয়েকটা বাক্য লিখে ফেলো।

I like managoes and so does my brother.

Calcutta is a big city and so is Bombay.

এ-রকম আরও যতগুলো পারো।

কিংবা পড়লে :

The children didn't agree to the proposal, and neither did Mr. Gupta.

তারপর লিখে যাও :

I don't like milk, and neither does my sister.

I haven't seen the Alps, and neither has any of my friends.

ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিংবা কোনোবার হয়তো দেখলে :

It didn't take her long to decide.

তখন লিখে চলো :

It didn't take him long to reach home.

কিংবা একটু অদলবদল করে লিখতে পারো :

He lost his way and it took him very long to reach the village.

এইরকম ভাবে হাতে-হাত মেলালে দেখবে কত সহজে ইংরেজি শেখা এগিয়ে চলবে।

বুন্টি এখন কোন্ বনে ?

এই আমার বেড়াল। নাম দিয়েছিলাম বুন্টি। বুন্টিকে চুপটি করে বসিয়ে রেখে ওর ছবি এঁকেছি। ছবিটা মনে হয় বুন্টির খুব পছন্দ হয়েছিল। বুন্টি দুধ-ভাত আর মাছ খেতে খুব ভালবাসত।

কোনদিন চুরি করে কিছু খায়নি। আমি তাকে খুব ভালবাসতাম। আমি যখন গান করতাম সে আমার কাছে বসে থাকত। আমার গান শুনে সে মিউ-মিউ করে ডাকত। আমি তখন বুঝতে পারতাম আমার গান বুন্টির খুব ভাল লাগছে।

একবার বুন্টির খুব অসুখ হল। বুন্টির মা তখন বুন্টিকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। আমি ভাবলাম অসুখ সেরে গেলে বুন্টি আবার আমাদের বাড়িতে ফিরে আসবে। কিন্তু বুন্টি আমাদের বাড়িতে আর ফিরে আসেনি।

আমি এখনও গান করি। আমার গান শুনে কেউ আর মিউ-মিউ করে ডাকে না। বুন্টি এখন কোন্ বনে আছে জানি না। সে কি এখন আর কারও গান শুনে মিউ-মিউ করে ?

ছবি ও লেখা : সুবর্ণা বিশ্বাস (বয়স ৬)

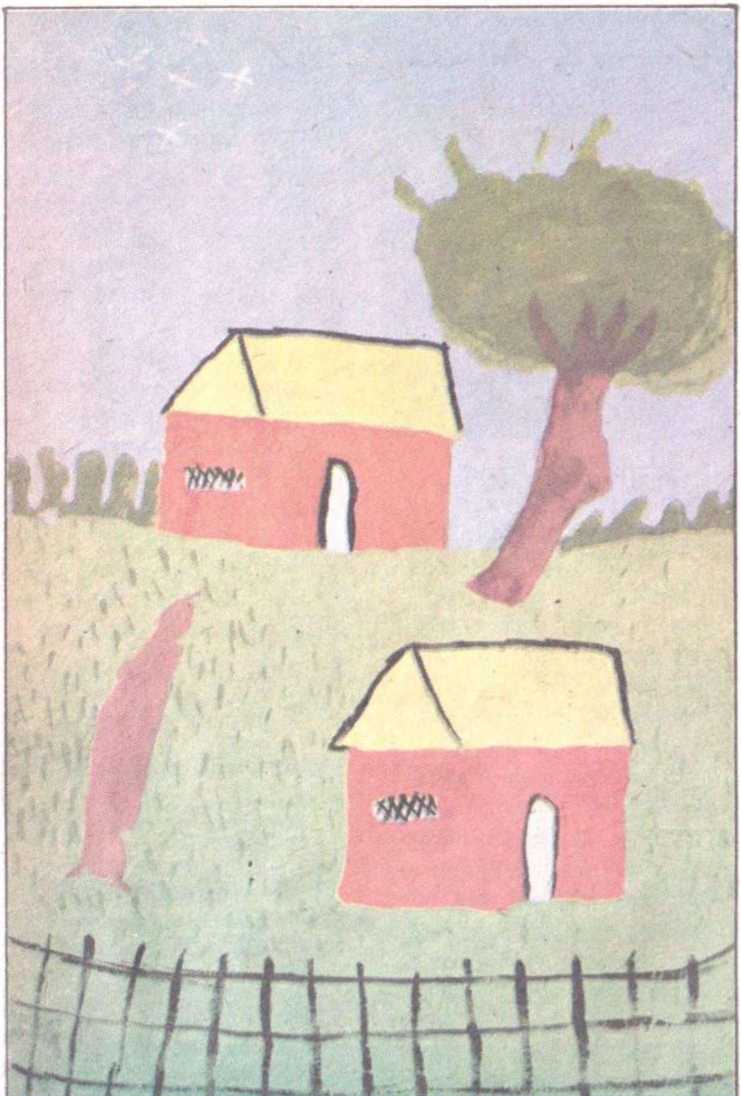

ছবি এঁকেছে সৌগত সরকার (বয়স ৭)

সদাশিবের দেশে

আমার বাপি পুনায় থাকেন। আমি আর মা-মণি পুনায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বম্বে থেকে পুনা যেতে অনেকগুলি সুড়ঙ্গ পার হতে হয়। আমি যাবার সময় গুনেছিলাম, ছাব্বিশটা সুড়ঙ্গ। আসার সময় সেটা হয়ে গেল সাতাশ।

পুনা খুব সুন্দর শহর। চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের ওপর অনেক দুর্গ আছে। একদিন আমরা পার্বতী-মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। এটাও আগে একটা দুর্গ ছিল।

মন্দিরের ওপর থেকে সন্ধ্যাবেলায় শহরের আলোগুলি অপূর্ব দেখায়।

আনন্দমেলায় সদাশিবের গল্প পড়ে আর ছবি দেখে আমার খুব পুনা যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। বাপিকে বলেছি, গরমের ছুটিতে আবার যাব পুনায়।

শান্তনু সেন (বয়স ৯)

পিকনিক

এ-বছর ঠিক হল মাইথনে পিকনিক হবে। সকালে আমাদের বাড়ির সামনে বাস এল। আমরা মাইথন গেস্ট-হাউসে গেলাম।

ওখানে প্রায় আড়াইশো জন লোক গিয়েছিল আমাদের আশেপাশে, জলের ধারে কত লোক পিকনিক করছিল। একটা ভিখিরি পরিবারও পিকনিক করছিল।

সকালে আমরা পাউরুটি, কলা আর ডিম খেলাম। তিনবার বিঙ্গো খেলা হল। তারপর আমরা দুপুরের খাবার খেলাম।

মায়েরা তাস খেললেন আর বাবারা ক্রিকেট খেললেন। আমরা ভাত, মাংস, ফুলকপির তরকারি, চাটনি আর মিষ্টি খেলাম। আমি পান খুব ভালবাসি, আমাদের পান খেতে দেওয়া হয়নি।

বিকেল চারটের সময় পিকনিকের গল্প করতে করতে বাড়ি এলাম আমরা।

নীপমঞ্জরী বর্মণ (বয়স ৭)

মুড়ি খেল মাছ

একদিন আমি মা-বাবার সঙ্গে মন্দিরে গিয়েছিলাম।

মন্দিরের পুবদিকে একটা দিঘি আছে। দিঘিতে বড়-বড় মাছ আর কচ্ছপ আছে। বাবা মুড়ি কিনে এনে জলে ফেললেন। মুড়ি পেয়ে মাছগুলো আনন্দ করে খেতে লাগল। তাই দেখে আমারও খুব আনন্দ হল।

নন্দিনী বিশ্বাস (বয়স ৫)

আনন্দমেলার গত ১২ জানুয়ারি সংখ্যায় ৯৫ পৃষ্ঠার ছবিটি এঁকেছে **অরিজিৎ মুখোপাধ্যায় (বয়স ৬)**। ছাপার ভুলে তার নাম বাদ পড়ে গিয়েছিল।

বাঁদরামি শুভজ্যোতি ঘোষ (বয়স ৯)

এবারের ছুটিতে বেনারস গিয়েছিলাম মা-বাবার সঙ্গে। আমরা ছিলাম গোধুলিয়ার গার্ডেন লজে। ওখানে খুব বাঁদরের উৎপাত। কখনো বাঁদররা হাতের ব্যাগ্ ধরে টানে, খুলে রাখা চটি-জুতো নিয়ে পালায় অথবা শুকোতে দেওয়া জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলে।

একদিন তো একটা বাঁদর আমার হাত থেকে দুটো কলা ছিনিয়ে নিয়ে তিনতলার বারান্দার রেলিঙে বসে গম্ভীরসে খেতে লাগল। ভোজনপর্ব সেরে বাঁদরটা আমাকে ভেঙচি কেটে লাফিয়ে অন্য একটা বাড়ির ছাদে চলে গেল।

বাঁদরের এই বাঁদরামিতে আমি একটুও দুঃখ পাইনি, বরং বেশ মজাই পেয়েছিলাম। আর একদিন সঙ্কট-মোচন মন্দিরের কাছে একটা বাঁদর হঠাৎ আমার মাথার রঙিন টুপিটা নিয়ে পালাল। আমার শখের টুপিটা খোয়া যাওয়ায় আমার খুব কষ্ট হয়েছিল।

আমাদের পাশের ঘরেই বেড়াতে এসেছিলেন অ্যাডভোকেট চ্যাটার্জিদাদু ও তাঁর সঙ্গীরা। সেদিন সকালে অফিসে বসে ম্যানেজারের সঙ্গে তিনি গল্প করছিলেন টেবিলে চশমা রেখে। এমন সময় একটা বাঁদর এসে চশমাটা তুলে নিয়ে লজের দেয়ালে বসে চশমা চোখে দিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। তাড়া খেয়ে চশমা ফেলে বাঁদরটা পালাল বটে, কিন্তু তখন চশমার কাঁচ আর অক্ষত ছিল না।

বাঘা

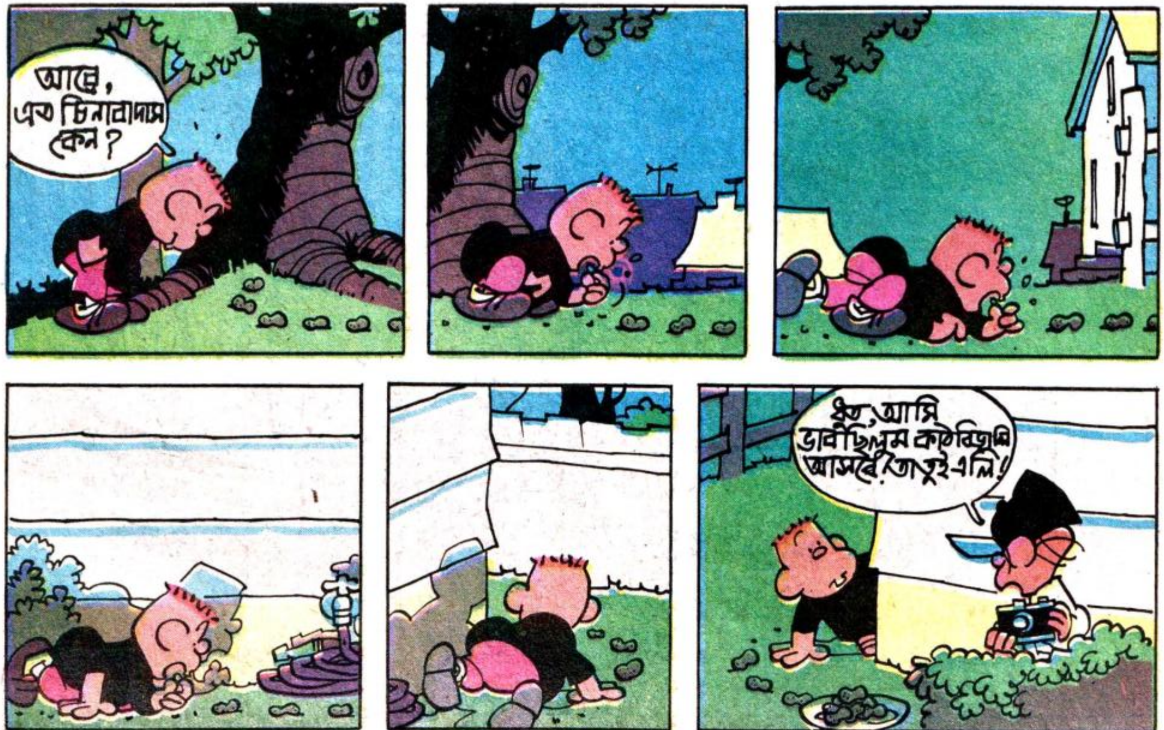

"মা বলতো আমি গালে
কি লাগিয়েছি ?"
"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে
গায়ের চামড়া ভালো থাকে । তাইতো আমি মুখে, হাতে,
পায়ে লাগিয়েছি । এবার আমাকে একটা হামু দাও ।"
ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
বোরোলীন
সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক
BOROLINE
GD
ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০০৮৮
HTC-GDP-3760R

পপিন্স তন্ত্র

রাম ও শ্যাম
বলে গল্পের ছড়া
মন দিয়ে শোনো
ভাই ছোট্ট বাচ্চারা !

পার্লে

কোনও এক হাতি আর ইঁদুরের দেখা হ'ল বনে
ইঁদুর গর্বে বলে, মোদের তফাৎ নেই, সমান দুজনে।
তুমিও দেখতে কালো, আছে লেজ আর চার হাত-পা
আমিও হুবহু একরূপ, মিছে কি কথাটা।
হাতি মুচকি হেসে বলে, সত্যিই ভাই
তোমাতে আমাতে তো, কোনও তফাৎই নাই।
তোমার যেমন বুদ্ধি, তেমনি চতুরালি
এস হাতে হাত মিলিয়ে মোরা পাতাই মিতালি।

এই বলে হাতি তার বাড়াল বিরাট হাত
দেখে ইঁদুর আঁতকে উঠে, ভয়ে কুপোকাৎ।
বলে ঢের হয়েছে মিতালি, এখন চাচা আপন প্র[illegible]
এই না বলে লেজটি তুলে গর্তে ছুট[illegible]চাচা।
দেখলে তো বাচ্চারা, এখন কি শিখ[illegible]ভাই...
নকল থেকে তোমাদের সাবধানে থা[illegible]চাই।
নকল লজেন্স খেলে হবে পেটের যন্ত্রণা...
আসল পপিন্স মজায় খাবে, নেই কোনও ভাবনা।

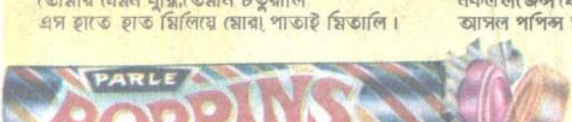

যে পপিন্সের ওপরে আছে রূপোলী পাত মোড়া...
জানবে তখন, তাতে আছে আসল পপিন্স ভরা।
নকল জিনিস থেকে শত হাত দূরে থাকা চাই-ই-চ
গল্পটি ফুরোলো, নটেগাছটি মুড়োলো, এবার আসি

everest/82/PP/431-bn